জয়জয়ন্তী

শ্রীসাধনা মিত্র

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড্‌ সন্স্‌ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা :
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

দাম—দেড় টাকা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড্ সন্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতার
পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিচয় প্রেস, ৮বি,
দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক মুদ্রিত

দিদাকে

এতে আছে :

উত্তরণ

মৃত্যুবাসর

ভ্রষ্টক্ষণা

অগ্নিশুদ্ধি

অধিকরণ

জয়জয়ন্তী

শ্রীমতী সাধনা মিত্রের কয়েকটি ছোট গল্প আমি প'ড়ে দেখেছি। তাঁর গল্পগুলিতে আন্তরিক অধ্য-বসায় এবং যত্নের পরিচয় আছে, এবং ভাষা রচনার গুণে বিষয়বস্তু মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে। এটি খুবই সুখের কথা। সম্প্রতি কয়েক বছরে অনেকগুলি লেখক ও লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই লেখবার ক্ষমতা আছে, এবং ইতিমধ্যেই তাঁরা ভবিষ্যৎ প্রতিজ্ঞার স্বাক্ষর তাঁদের নানা রচনায় রাখতে পেরেছেন। শ্রীমতী সাধনা সেই গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হবেন—এই আমার ধারণা। তাঁর লেখার ক্ষমতা আছে, তাঁর মন কল্পনা-প্রবণ, এবং তাঁর কোনো কোনো গল্প বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। লেখক লেখিকার দক্ষ লেখনী পাঠকের মনকে টেনে নিয়ে যায় এক অলীক সংসারে ও এক মিথ্যা ভাবনা বেদনা সুখ দুঃখের আবহের মাঝখানে—যেটি আগাগোড়া অবাস্তব। কিন্তু অবাস্তব মানেই মিথ্যা নয়। স্বর্গ অবাস্তব, কিন্তু সে সত্য আমাদের কল্পনায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য

বাস্তবিকতার ওপর দাঁড়িয়ে নেই, কিন্তু তার সত্যে আমাদের মন ভরপুর। অনেক মিথ্যাই হোলো পরম সত্য মানুষের জীবনে। আসল কথা, লেখক লেখিকার মানসিক সততার মধ্যেই কল্পিত বিষয়বস্তুর সম্ভাব্যতা,—রসসাহিত্যের সার্থকতাও সেইখানে।

শ্রীমতী সাধনা মিত্র লিখতে জানেন বৈ কি। লোকচরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর অনুরাগ অনেকস্থলে প্রকাশ পেয়েছে দেখে আমি উৎসাহিত বোধ করেছি। তাঁর সাহিত্যপ্রচেষ্টা সুপরিণত ও সার্থক হোক এই কামনা করি।

প্রবোধকুমার সান্যাল

বৈশাখ ৮, ১৩৬০

উত্তরণ

পত্রিকা অফিস।

সম্পাদকের খাসকামরা।

যেমন হয়ে থাকে তেমনই গতানুগতিক নয় কিন্তু। শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অশেষ হয়ে থাকার প্রচেষ্টা যেমন দেখতে পাওয়া যায় সারা পৃথিবীতে তেমনই ব্যঞ্জনার রূপ এ ঘরটি ভরে।

নিছক ব্যবসার খাতিরেই পত্রিকা বার করে অদ্ভুত কূটনীতি প্রয়োগে এই দুর্দ্দিনের বাজারেও বেশ ফেঁপে ফুলে উঠতে পেরেছেন একাধারে কর্ণধার এবং সম্পাদক মহাপ্রভু—অন্ততঃ অফিসের নিজস্ব ঝক্‌ঝকে ছোটো বাড়ীটি এবং সম্পাদকের চক্‌চকে ছোট্টো গাড়ীটি তার নির্ভুল প্রমাণ বহন করবে নিঃসন্দেহে।

আর এই ঘরটি।

ইটালীয়ান টালি না হলেও কফি-রঙা কুচো মোজায়েকের মেঝে—টক্‌টকে বার্নিশ করা সেক্রেটারিয়েট টেবিল ঘেরা খানচারেক পরিচ্ছন্ন চেয়ার, ঘনরঙীন নিটোল ক'টি পর্দ্দা জানলায় দরজায়—

শাদা চূণের দেওয়ালে ক'খানি বিলিতী ল্যাণ্ড্‌স্কেপ নিখুঁতভাবে টাঙানো।

কোনো রুচিবান ধনী ভদ্রলোকের ড্রয়িং-রূম্ বলে ভুল করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আরোও আছে ঘরে।

সেক্রেটারিয়েট টেবিল-মোড়া রেক্সিনের 'পরে রাখা আছে টেলিফোন, কলমদানি, লেটার কেস্ ও ব্লটিং ফাইলের সঙ্গে শ্বেতপাথরের একটি সুদৃশ্য কাগজচাপা আর জয়পুরী মিনা করা ফুলদানিতে একগুচ্ছ শুভ্র রজনীগন্ধা।

টেবিলের নীচেকার বাজে কাগজের ঝুড়িটিও ভারি চমৎকার দেখতে। বাজে কাগজ ওতে ফেলতে মায়া লাগে।

যেন সম্পাদক আগন্তুকদের দেখাতে চান নীরস কমার্শিয়াল্ পত্রিকা এডিট করেও মনের সৌখীনতা বজায় রাখা সম্ভব—নিজেকে তাজা রেখেছেন তিনি যথেষ্ট।

আগন্তুকদের মনের কথা? ভগবান জানেন!

টেবিলের সামনেকার একটি বিশিষ্ট রিভলভিং চেয়ার সম্পাদকের নিজস্ব। অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক লোক, ব্যক্তিত্বের জৌলুষ দুর্দান্ত। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স—মাথার চুল পাতলা হতে সুরু করেছে দেহখানি তবু বেশ টনকো আছে—নিয়মিত ব্যায়ামপুষ্ট রীতিমতো সুখাদ্যাহারী চেহারা। রঙ্ ছাত্রাবস্থায় গৌর ছিলো—কর্ম্মাবস্থায় তার ওপরে অযত্নের আচ্ছাদনী পড়েছে। মুখশ্রীর মধ্যে নাক, চোখ, ভ্রূ সবই তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ—মনে হয় লাবণ্যের ঘাটতি পড়েছে মুখে যেন। দীর্ঘাকৃতি, বেশবাস সর্বদা অত্যন্ত ফিটফাট খোপদোরস্ত।

অফিসে থাকাকালীন সম্পাদক মশায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। পুরোদস্তর চালু অফিস্—সর্বদা লোকের পর লোক আসছে, ফোনের পর ফোন, কাজের পর কাজ, ঝামেলার ওপর ঝামেলা।

এরই এক ফাঁকে খাসবেয়ারা মুকুন্দ একখানা কার্ড হাতে করে এলো।

: ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন।

: কে? ভ্রূ কুঞ্চিত করে সম্পাদক তাকালেন।

মুকুন্দের হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে নাম পড়লেন একবার।

: তিলোত্তমা চ্যাটার্জ্জি। আচ্ছা—নিয়ে আয়।

ক'সেকেণ্ড পরেই মুকুন্দের পিছনপিছন একটি মহিলা পর্দ্দা ঠেলে সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মুকুন্দ ঠিক সাধারণ বেয়ারা নয়—ম্যাট্রিক পাশ বেশ মার্জ্জিত ছোকরা। সসম্ভ্রমে মহিলাটিকে নিয়ে এসে একটি চেয়ারে বসালো। ছোটোখাটো মানুষটি—শ্রী যেন উছলে উঠছে সারা অঙ্গ ঘিরে। রঙ্ চিকণ—মুখটি অনেকটা জাপানী জাপানী, ছোটো ছোটো নাক চোখ কিন্তু ভারী মিষ্টি। যৌবনের বোধহয় পড়ন্ত বেলার দিকে ঢলবার সময় এসেছে তবু তাকে আটকে রাখবার সূক্ষ্ম কারু-কৌশল চমৎকার আয়ত্ত্ব করেছেন মহিলা—শাদা শাড়ী জামায় শাদা ডিজাইন্ এঁকে এত সুপ্রসাধিতা হতে পারা চলে?

কিন্তু অতশত দেখবার সময় সম্পাদক প্রবরের হাতে নেই।

: বসুন। নমস্কার। অপেনার জন্যে কি করতে পারি বলুন তো?

: আমি কি এডিটর মিঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলছি?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: আমার একটু দরকার ছিলো। আমি এসেছিলাম্ একটা অনরে-রিয়মের সম্পর্কে।

: ওঃ। কাইণ্ডলি যদি একটু অপেক্ষা করেন, আমি কয়েকটা কাজ সেরে নিই। বুঝতেই পারছেন টাকা পাওয়ার কাজগুলোর প্রায়োরিটি আগে—টাকা দেওয়ার ব্যাপারে যতটা দেরী করা সম্ভব আমরা করে নিই ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে।

সম্পাদক মহাশয় নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগলেন—মহিলাটি নিজের মনে ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলেন।

গোটা তিনেক জরুরী চিঠির উত্তর লিখে, গোটা দুয়েক ফোন্ করে, কয়েকটা সইসাবুদ ও চেক্ করে সম্পাদক মহাশয় এদিকে ফিরলেন।

: কিছু মনে করবেন না—অযথা বসিয়ে রাখলাম······

: না না ঠিক আছে। আচ্ছা গত মাসের কাগজখানা আছে কি ?

: এই যে নিন না !

সহসা মুকুন্দ ঢুকলো ব্যস্ত ভাবে।

: মল্লিকবাবু এসেছেন আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবেন, জরুরী দরকার। নীচে বসিয়েছি, ওপরে নিয়ে আসবো কি ?

: না না, আমিই যাচ্ছি বরং—

সম্পাদক মশায় বিব্রত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন,

: আরো দু'মিনিট বসতে হবে— আমি আসছি এক্ষুনি।

দু'মিনিট নয়, ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই সম্পাদক আবার এসে ঢুকলেন। মহিলাটি মণিবন্ধে বাঁধা ছোটো রিষ্ট্-ওয়াচ্‌টি লক্ষ্য করছিলেন। বোধ হয় অফিস ঘরের বড়ো ওয়াল্-ক্লকের সঙ্গে সময় মিলোচ্ছিলেন।

সম্পাদক মহাশয় জুৎ করে চেয়ারে বসলেন।

: কিসের অনরেরিয়াম্ বলুন তো ?

: কিছুদিন আগে সুবীরা দেবী বলে একজন মহিলা আপনার কাগজে দুটো রচনা পাঠিয়েছিলেন। আপনার মনোনয়ন পেয়ে সে দুটো পর পর দু'মাসে ছাপা হয়েছিল। তারি দরুণ প্রাপ্য টাকা যদি কিছু থাকে···

: বিলক্ষণ ! যদি কিছু থাকে মানে ? এটুকু ক্ষুদ্র গর্ব্ব করতে পারি যে বাজারের এখনকার সমস্ত কাগজের তুলনায় আমাদের রেমিউনারেশন অনেক বেশী। কিন্তু কোন্ মাসে বেরিয়েছে বলুন তো ?

: মাসটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না—দেখুন অনেক মনে করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই মনে আনতে পারছি না। তবে বছর চারেক আগে এটা ঠিক।

: বছর চা—রেক আগে বলেন কি ?

এতদিন স্নবীরা দেবী ছিলেন কোথায় ?

: স্নবীরা দেবী ভারতবর্ষেই ছিলেন না—এখানে রচনা পাঠিয়েই উনি রেঙ্গুনে চলে গিয়েছিলেন। কিছুদিন হোলো মাত্র ফিরেছেন, তাও পশ্চিমে আছেন। এখন তাঁর ফুরসৎ হয়েছে—খোঁজ নিয়ে জেনেছেন সে রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। আমাকে লিখেছেন সম্ভব হলে সেই কপি দুটো আর তার দরুণ টাকাটা জোগাড় করতে।

অপ্রীতিকর ঝঞ্ঝাট একটা। নীরস স্বরে সম্পাদক বললেন : এ তো বড়ো গণ্ডগোলের কথা। চার বছর আগেকার ব্যাপার···কোন্ সালটা ঠিক করে বলতে পারেন ?

: না, দেখুন সেটাও আমি ঠিক বলতে পারি না। আপনাদের একটু খাটতে হবে—

: একটু কেন, বেশ খাটতে হবে দেখছি। অল্প হাসির দ্রবণে কথাটাকে গুলে দিয়ে হালকা করলেন সম্পাদক। লোককে না চটাবারই ব্যবসা তাঁর—মূলমন্ত্রটি পাকা রকম জানা। একটা স্লিপে কি খানিকটা লিখে টেবিলের ওপরকার কলিং বেলে সজোরে একটা চাপড় মারলেন মিঃ রায়। মুকুন্দ এসে দাঁড়ালো তৎক্ষণাৎ।

স্লিপটা মুকুন্দের হাতে দিলেন তিনি : যামিনীবাবুকে এটা দিয়ে এসো। ঠিক মতো খোঁজ করেন যেন—আর একটু তাড়াতাড়ি—এঁকে তো অনেকক্ষণই বসে থাকতে হয়েছে···

মুকুন্দ চলে গেল।

সম্পাদক একটা কি লেখায় আবার মনোনিবেশ করলেন।

: আচ্ছা আর কোনো জার্ণাল আছে কি ?

: হ্যাঁ, কত চান ? আপনার সামনেকার ড্রয়ারটা টানুন ওতেই সব পাবেন হালের কাগজ যা কিছু। মাসিক পত্রিকার অফিসে জার্ণালে

থাকবে না তা কখনো হয়? গত মাসের কাগজখানা আপনার পড়া হয়ে গেল?

: কিই বা এমন! দেখা হয়ে গেছে সব।

: এর মধ্যে?—দেখুন যদি একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না বোধ হয়। নিজের কাগজের বিষয়ে আমি বড্ডো টেণ্ডারড্ টাইপ্। আমি লক্ষ্য করেছি কাগজটার একটা দুটো পাতা ছাড়া আর পাতাই ওলটাননি আপনি এতটা সময়ে। অথচ রচনাগুলোর সঙ্গে বহু পরিচয়ের মতো মুখ ভাব। অর্থাৎ ঐ সংগ্রহীতাখানা আপনি ইতিপূর্ব্বে পড়েছেন ভালো ভাবেই কিন্তু কোনো কারণে হয়তো দেখাতে চান কাগজখানার ওপরে আপনার বিতৃষ্ণা আছে।

মহিলাটির চোখে মুখে কৌতুকের ঝিলিক্ মারলো।

: হতে পারে। কিন্তু আপনি সেটা ধরলেন কি করে? এদিকে তো চোখ ছিলো না আপনার।

: না, তবে লক্ষ্য ছিলো। আপনি একটা পাতা খুলে খানিকটা চুপ করে বসে থেকে আবার তাড়াতাড়ি এক গোছা পাতা এক সঙ্গে উলটে ফেললেন। এটুকু খেয়াল করেছি।

: অশিষ্ট কৌতূহল মার্জ্জনা করবেন—কাগজটার নাম 'সংগ্রহীতা' হোলো কেন?

: তার কারণ যেখানে যত ভালো রচনা – বড়ো লেখকদের চিন্তাধারা, সাহিত্যিকদের সৃষ্ট মণিমুক্তা সব একে একে সংগ্রহ করে এক সঙ্গে জড়ো করে প্রকাশ করা হয় এই পত্রিকাতে বলেই এঁর নাম সংগ্রহীতা। পৌরাণিক উপাখ্যানে শুনেছেন তো ব্রহ্মার মানস কন্যার কথা? স্বর্গলোকে দেবতারা সকলে মিলে এক নারীমূর্ত্তি সৃষ্টি করলেন। ত্রিলোকের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু উত্তম সমস্ত তিল তিল ক'রে চয়ন করে

সেই নারীকে গড়া হোলো—তিলোত্তমা হলেন তিনি তাই। এও সেই গোছের অনেকটা আর কি।

তিলোত্তমা দেবী অন্যদিকে মুখ ফেরালেন একবার।

কিন্তু মেয়েদের মন। আবার একটু পরেই ফিরলেন এদিকে।

ঃ সেই হিসাবে "আহরণী"তো আপনার পত্রিকার নাম হতে পারতো। অপেক্ষাকৃত মিষ্টি শুনতে।

ঃ তা পারতো। শুধু "আহরণী" কেন "চয়ন" বা "সাজি" কিংবা "মালিকা" হওয়াও সম্ভব ছিলো। কিন্তু ও সব নামেরই একটা না একটা পত্রিকা বা বই বেরিয়ে গেছে আগেই—আমি একটু নতুনত্বের পক্ষপাতী।

ঃ নতুনত্ব না বৈচিত্র্য ?

ঃ ও দুটোই ধরতে গেলে। কিন্তু—ওঃ দেখুন্, মনে পড়ে গেছে আমার। সুবীরা দেবীর রচনা দুটো ছিলো—একটা বেশ বড়ো গদ্য-কবিতা আর একটা দার্শনিক প্রবন্ধ। ও দুটো বেরিয়েছে তেরোশো তিপ্পান্ন সালের শ্রাবণ আর ভাদ্র মাসে—পর পর। হ্যাঁ বর্ষাকালেই। কারণ কবিতাটার মর্ম্ম ছিলো শীতকাল সম্বন্ধে। বর্ষাকালে শীতের কবিতা দেখে আমি একটু অবাক হয়েই গিয়েছিলাম।

ঃ বর্ষাকালে তো লেখা সম্ভব—বসন্তকালেও যদি শীতের কবিতা লিখে পাঠাতেন সুবীরা দেবী আমি ততটা অবাক হতাম না যতটা হচ্ছি আপনার স্মৃতিশক্তির প্রখরতা দেখে।

সম্পাদক মশায় একটু হাসলেন।

ঃ স্মৃতিশক্তি আমাদের প্রখর করতেই হয় বুঝলেন্, না হলে কাগজ চলে না। এ তো তুচ্ছ কথা—বড়ো বড়ো সাহিত্যিকদের আমার কাগজে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত কোনো কোনো রচনা লাইন বাই লাইন মুখস্থ বলে দিতে পারি—তবে আগেই অক্ষমতা স্বীকার করছি, সুবীরা দেবীর

কবিতা বা প্রবন্ধ কোনোটাই মুখস্থ বলা সম্ভব হবে না কারণ উনি নেহাৎই অখ্যাতা।

: কণ্ঠস্থ করেননি তাই। কিন্তু আপনার লোকেরা হয়তো খুব খুঁজতে থাকছেন অনর্থক—

: হ্যাঁ —মুকুন্দ আসবে এক্ষুনি –

সত্যি সত্যিই মুকুন্দ তক্ষুনি এলো এক গ্লাশ জল নিয়ে। জলটা খেয়ে সম্পাদক গ্লাশটা ফিরিয়ে দিলেন ওর হাতে।

: মুকুন্দ—যামিনীবাবুকে বলে দাও 'তিপ্পান্নর চতুর্থ, পঞ্চম সংখ্যা। আর হ্যাঁ—আপনি এক কাপ চা খাবেন কি?

: ধন্যবাদ। আমি এখন চা খাই না।

: ঠিক আছে, তুমি যাও।

মুকুন্দ চলে গেল।

সম্পাদক, মিঃ রায় একটু ইতস্ততঃ করলেন। তারপর বললেন –
: সাল আর মাসটা পাওয়া গেলেও এখনো অনেক ব্যাপার আছে। কলাম্ হিসাবে আমাদের রেট। অথচ···আর্টিক্‌ল্ দুটো আমার মুখস্থ নেই কলামের ঠিকমতো হিসেব দিতে পারবো না। তার জন্যে অফিস্ কপি কন্‌সাল্ট্ করা দরকার। কিন্তু অফিস্-কপি আপাততঃ এখানে নেই। অন্য কোনো কপিও নেই তখনকার। তেরোশো তিপ্পান্নর অ্যাকাউন্ট্ বুক্‌ও টোটালি ক্লোজ্‌ড্ হয়ে গেছে—ডুপ্লিকেট্ ইস্যুয়িং হচ্ছে কিনা সেটাও তো জানা দরকার। অথরাইজিং লেটারও নেই বোধ হয়। দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, টাইম্ বার্‌ড্—ও হিসেব আপনার তামাদি হয়ে গেছে।

: তামাদি হয়ে গেছে? কিন্তু অথরাইজিং লেটার আমি আনিয়ে দিতে পারি দিন দুয়েকের ভেতরেই।

: কি সুবিধা হবে বলুন তাতে আর—অনেকদিন হয়ে গেছে যখন

বুঝছেন না? আমি অত্যন্ত দুঃখিত—কিন্তু এতদিন পরে পুরোনো হিসেব টেনে এনে নতুন করে কিছু করতে পারা সম্ভব হবে না। কিছু মনে করবেন না···

ঃ না না ঠিক আছে···অনেক ধন্যবাদ, যথেষ্ট করেছেন আপনি। আচ্ছা আমি চলি এখন—নমস্কার!

ঃ নমস্কার! ওরে মুকুন্দ—

তিলোত্তমা দেবী আর অপেক্ষা করলেন না, বেরিয়ে এলেন। সামনেই সিঁড়ি। সোজা নেমে এলেন নীচে। কিন্তু দাঁড়াতে হোলো। লরীর উপরে কয়েকটা বড়ো বড়ো প্যাকিং বাক্স চাপাচ্ছিলো জনদুয়েক মুটে সামনেই। পথ বন্ধ। তিলোত্তমা দেবী ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। মুকুন্দ নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে একটা কোট হাতে করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারি বুটের মস্ মস আওয়াজ করতে করতে সম্পাদকমশাই স্বয়ং নামলেন।

ঃ আরে! আটকে গেছেন যে! হ্যাঁ, এটা ওদের মাল তোলার সময় তো! ওরে তোরা সর্ সর্—আমাদের বেরিয়ে যেতে দে বাবা। এই যে আসুন এদিকে। আমি খেতে যাচ্ছি—অমনি একবার প্রেসেও ঘুরে আসবো—আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো'খন।

ঃ না না, আপনার কষ্ট করার দরকার নেই—আমি বেশ যেতে পারবো।

ঃ কষ্ট আবার কি! এটুকুকে কষ্ট বললে 'কষ্ট' কথাটার গুরুত্ব কমে যায়। অনেকটা সময় নষ্ট হোলো আপনার অথচ কিছু লাভও হোলো না—চলুন গাড়ীতে গেলে তবু একটু সময় বাঁচবে।

'সময় বাঁচিয়ে আমার বিশেষ লাভ হবে না' বলতে যাচ্ছিলেন তিলোত্তমা দেবী কিন্তু বলা হোলো না। সম্পাদক মশায়ের প্রচণ্ড

ব্যক্তিত্ব ভরা অনুজ্ঞা যেন তাঁকে অদৃশ্য ঠেলা মেরে মেরে গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে।

মুকুন্দ কোট্‌টা সিটের পিছনে রাখলো। সম্পাদক ড্রাইভারের সিটে অধিষ্ঠিত হলেন।

: কোথায় যাবেন আপনি ?

একটা রাস্তার নাম বললেন তিলোত্তমা।

খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সুনীল আকাশে মেঘ ও রোদের অপূর্ব্ব লুকোচুরি খেলা চলেছে, বাতাসে হৈমন্তীর শিশির-ভেজা গন্ধ একটা কেমন। খোলা রাস্তা দিয়ে গাড়ী ছুটেছে—মুখে চোখে হাওয়ার ঝলক্ লাগছে—কচি কোঁকড়া কয়েকগাছা চুল আমেজী ঝাপটাও মারছে কানের দুপাশে। রাস্তায় রাস্তায় জনকল্লোল—কর্ম্মব্যস্ততার প্রতিযোগিতা চলেছে ক্রমাগত শহর কোল্‌কাতাতে।

খেয়াল যখন হোলো লক্ষ্য করলেন তাঁর গন্তব্যস্থানাভিমুখে গাড়ী যাচ্ছেনা মোটেই। ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠলো তিলোত্তমার তবু বললেন না তিনি কিছু।

বসে রইলেন পাথরের পুতুলের মতো।

আরো খানিকক্ষণ পরে সহসা একটু ঝুঁকে পড়লেন তিলোত্তমা —সামনের দিকে।

: ড্রাইভিং শিখেছো দেখছি।

: শুধু ড্রাইভিং কেন, দীর্ঘ দশ বছরে আরো অনেক কিছু শিখতে হয়েছে—পরিচয় পাবে ক্রমে ক্রমে।

: পেয়ে এলাম তো একদফা, আর স্পৃহা নেই। কিন্তু···চলেছ কোথায় ?

: অতিথিকে মিষ্টিমুখ করানো হয়নি, কর্ত্তব্য অসমাপ্ত থেকে গেছে, ভাগ্যিস মনে পড়লো। তাই চলেছি রেঁস্তোরায়।

ঃ মিষ্টিমুখ ছাড়াই অতিথি পরিতৃপ্ত হয়েছেন যথেষ্ট—সাদর অভ্যর্থনাতে। যে অতিথির দাবী তামাদি হয়ে গেছে তিনি আর বেশী কী আশা করতে পারেন? অমৃত মধুর কণ্ঠে সেই তামাদির ঘোষণাতেই পেট ভর্তি হয়ে মুখ মিষ্টি হয়ে যাবার কথা—রেঁস্তোরাতে যাওয়ার কোনো দরকার হবে না—

ষ্টিয়ারিং হুইল্ থেকে সটান এদিকে ঘুরে বসলেন শঙ্কর রায়, এডিটর—তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠলো তিলোত্তমা কেন্দ্রে।

ঃ কথা তো পৃথিবীতে অনেকই থাকে—সব কথা রাখতে গেলে আমারও আজ তহবিল ফাঁকা না হওয়ারই কথা। বাজী আমি পুরো-পুরি জিতে নিয়েছি আজকে—তার প্রাপ্যও কি আমার পাওনা হবার কথা নয়? দশ বছর আগে যে বাজী রাখা হয়েছিল—আমার মতো কঠোর বস্তুতান্ত্রিক লোকও সাহিত্যের কোমল ছাঁচের মশলা হয়ে গড়ে উঠেছে আজ তিল তিল করে সে বাজী জেতার জন্যেই তো? কি বলতে চাও তুমি? আমার সেই দশ বছর আগেকার জন্মদিনে তুমি পাথরের পেপার-ওয়েট আর ফুলদানী উপহার দিয়েছিলে—ব্যঙ্গ করে বলেছিলে 'মাড়োয়ারীর ভবিষ্য গদী সাজাবার জন্যে দিলাম'—তারা কি যোগ্য মর্য্যাদা পায়নি এখনো সুসাহিত্য পত্রিকা-সম্পাদকের অফিস রুমের টেবিলে স্থান পেয়ে?

ঃ নিজের চোখে তো তাই দেখতে না এসে পারলাম না—কতদূর কি করতে পারলে! হতাশ হয়েছি অস্বীকার করবো না। মাড়োয়ারীর গদীই বানিয়েছ তুমি—কেবল খেরোয় বাঁধানো হিসেবের জাবদা খাতাখানার মলাট বদলিয়েছ। রঙীন গেট আপ্ করে বিচিত্র নাম দিয়েছ 'সংগ্রহীতা'।

ঃ এমন কোনো শর্ত্ত ছিলো না যে সাহিত্যের কারবার খুলতে হবে

নিছক ফাইন আর্টের মূলধনে। কমার্সের মিশেল না দিলে বাজারে চলে না। যাই হোক্—আমি আজ সার্থক কৃতকর্ম্মা।

: সেই আনন্দেই বিভোর হয়ে থাকো। আরে আরে লোকটাকে চাপা দেবে যে! অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ—তোমার শুদ্ধমাত্র সঙ্গী হওয়ার দোষে আমাকেও টেনে হাজতে পুরবে যে তাহলে!

: ভয় নেই! সাবধানে একটা গরুর গাড়ীর পাশ কাটাতে কাটাতে শঙ্কর গম্ভীর গলায় বললেন।

: তোমাকে আমি টানবো না যথাসম্ভব বেরিয়ে যাবারই সুযোগ দেবো।

: ভালো চালাতে শেখনি দেখছি—

: কিন্তু চালনা করতে শিখেছি।

তাই নাকি? শুধু জড়কে না প্রাণীকেও? বস্তু অবস্তু সব কিছুকেই?

: জানতেই পারবে।

: ভালো! হ্যাঁ বাজীর কথা বলছিলে। কি শর্ত্ত ছিলো বলো তো সে বাজীর? মনে নেই অতদিন আগের কথা ঠিক।

: মনে আছে। শর্ত্ত ছিল—তুমি হারলে তোমাকে দেবে। আমি হারলে আমাকে দেবো।

খিলখিল্ করে হেসে উঠলেন তিলোত্তমা!

: সত্যি ব্রেন্ বটে তোমার! কি শর্ত্তই না বানিয়েছিলে। কোনো-টাতেই ফাঁকি পড়তে চাওনি।

: নিজেকে নিঃস্বত্ব হয়ে অপরকে দান করে দেওয়াটা কি কম ফাঁকিতে পড়া নাকি? সৌভাগ্যবশতঃ—আমি জিতেছি। আমাকে আর অন্ততঃ নিজেকে দান করে ফতুর হতে হবে না।

: এতই যখন স্মরণশক্তি তোমার—বাজীর আরেকটা শর্ত্ত মনে করতে পারো?

—পারি। সেদিক দিয়ে যদি যেতে চাও তো আমি কোটিগুণ জয়ী। এদিকে তবু ব্যবসার ছিদ্র আছে, ওদিকটা একেবারে নির্ভেজাল।

এতদিনের মধ্যে আমি একটিবারও তোমাকে বিরক্ত করিনি, উত্যক্ত করিনি ক্ষণকাল—কেবল নিঃশব্দে অক্ষয় ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে থেকেছি।

তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই লুকোতে পারো না তিলোত্তমা। আমি জানি প্রতিটি সংগ্রহীতার প্রথম পাতার প্রথম লাইন্ হতে শেষ পাতার শেষ লাইন অবধি তোমার কণ্ঠস্থ এমন কি প্রবাসে থাকাকালীন অবস্থাতেও তুমি কষ্ট করে জোগাড় করেছো পত্রিকাটা, একটাও বাদ দাওনি।

মনে পড়ে—তোমার কবিতার শেষের লাইনটা ?

উপাসিত অবদানে
ভরেছি অর্ঘ্যের থালি—হে রিক্তা ধরিত্রী !!
মেদুর বর্ষায় হারা শীত উত্তরণী—

মনে পড়ে ?

—পড়ে। সত্যিই আমি তোমার কাছ হতে কিছু লুকোতে পারি না শঙ্কর—অকপটে স্বীকার করছি। তাইতো বাজীতে হেরেছি জেনে নিজেই এসে তোমার দ্বারে উত্তীর্ণ হলাম নিজেকে দান করে প্রাপ্য মেটাতে।

কিন্তু···দ্বিতীয় শর্ত্তটা তুমি অত অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললে কেন শঙ্কর ? এত শীতল নিরুত্তাপ তোমার তরফ, আমি তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—আমাকে দেখে তুমি তোমার মেয়েকে স্কুলে ভর্ত্তি করার কথাই আলোচনা করবে হয়তো।

এবারে হাসবার পালা শঙ্করের।

—চিরকাল তোমরা আমাদের অবিশ্বাস করে আসছো অথচ চিরকাল নিষ্ঠার পরীক্ষাতে আমরা ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আসছি।

একটু থামলেন শঙ্কর।

ঃ আমারো কিন্তু একটু সংশয় থেকে গিয়েছিল।

বাপমায়ের দেওয়া নাম 'চিন্ময়ী'টা অপছন্দের অজুহাতে তো ঝেড়ে ফেলে দিলে! আমি সাধ করে নাম দিলাম 'তিলোত্তমা', সেটা তো তখনো পর্য্যন্ত বজায় ছিলো। আবার 'সুবীরা' দেখে খটকা লাগলো বেশ। কে জানে—অনেকদিন তো কোনো সম্বন্ধ নেই, নতুন নাম ধরে ডাকবার লোক আসমান থেকে গজিয়ে উঠেছে হয়তো ইতিমধ্যে।

তিলোত্তমা প্রায় গড়িয়ে পড়লেন সিটের ওপরে।

—এই তোমার আমাকে চেনা জানার গর্ব্ব?

বুড়ো হয়ে মরতে চললুম আর এখন এই বয়সে···ছি ছি!—একটু থামো দিকিনি, দরজাটা খুলে সামনে যেতে দাও। অনেকদিনের একটি প্রণাম আমার কাছে জমা হয়ে আছে তোমাতে উৎসর্গীত। পাওনা মেটাই আজ।

মৃত্যু বাসর

গ্রামের পুব দক্ষিণ দিকে পড়ে 'বৌমারীর ডাঙা'।

দিগন্তজোড়া প্রান্তর ধূ ধূ করছে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটা আগাছার ঝোপ ছাড়া অতবড়ো মাঠে কোথাও এক টুকরো ঘাস অবধি জন্মায় না—এক ফালি ছায়া, তৃষ্ণা মেটাবার এক ফোঁটা জল রক্তগঙ্গা হলেও পাওয়া যায় না বৌমারীতে—

অথচ পলতাডাঙার পশ্চিম দিক পানে আধক্রোশও যেতে হয় না ময়ূরাক্ষীকে পেতে হলে। দুরন্ত স্রোতস্বিনী ময়ূরাক্ষী—উত্তাল সুনীল জলোচ্ছ্বাস দুচোখ ভরে দেখা কুলোয় না। তৃপ্তিহীন আক্রোশে দুপাড়ের শক্ত মাটিকে ক্রমাগত তীব্র আঘাত করে চলেছে তো চলেছেই—ধ্বসাতে না পারার ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ গর্জ্জনও করছে অনবরত—নদী তো নয় যেন পাথার। দুপুরের জ্বলন্ত রোদ ময়ূরাক্ষীর ঢেউগুলোর মাথায় মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দেয় – সহস্রশীর্ষ অনন্ত নাগের মাথাগুলো স্বর্ণাভায় চিকচিক করতে থাকে—গ্রামের লোকেরা বলে, "নদী তো নয় সাপিনী, যেন ফুঁসছে।"

জ্যোৎস্নায় ময়ূরাক্ষীর রূপ আরেক রকম।

সুন্দরী লাস্যময়ী নর্ত্তকী জেগেছে তখন—

রূপোলী ওড়না গায়ে, পায়ে ঝুমঝুম্ করে বাজছে গুজরীপঞ্চম।

শাদা জ্যোৎস্নায় শাদা চাদর বিছিয়ে শান্ত স্তব্ধ ভাবে পড়ে থাকে

বৌমারীর মাঠও। তখন তাকে দেখে কল্পনাও করা যায় না দিনের বেলা কেমন ভীষণ তেজী চেহারা হয়; দুপুরের সূর্য্যের তাপে তপ্ত হয়ে নগ্ন তামাটে বালির রাশ অসহ্য দহনে আগুন ছড়াতে থাকে চারদিকে। ময়ূরাক্ষীর তরঙ্গের মতো সোনা চিক্‌চিক্ করে না এখানে, কেমন একটা ধোঁয়া ধোঁয়া মতো উত্তাপের বাষ্প উঠতে থাকে মাঠের এধার থেকে ওধার থেকে। ধারালো তামা-রঙা বালির আবরণে বৌমারীর সারা দেহ ঢাকা—গোড়ালী অবধি বসে যায়; লোকে বলে 'রাক্ষুসী মাঠ—জল পায় না এক ফোঁটা—তেষ্টায় তাই জীব টানে।' গোরু ছাগলকে ও মাঠ পার করানো বড়ো দায়।

সুজলা ময়ূরাক্ষীর এত কাছে এমন বন্ধ্যা মরুভূমির সৃষ্টি হোলো কি করে এ বড়ো আশ্চর্য্য। জনশ্রুতি এই যে নৈসর্গিক উপায়ে নাকি ও মাঠের দশা অমনধারা হয়নি, হয়েছে অন্য কারণে।

পলতাডাঙার অতিবৃদ্ধ অধিবাসীরা বলেন, ঐ মাঠে শিশুকালে তাঁরা খেলা করে বেড়িয়েছেন, তখন যে ও মাঠ কোনোদিন এমন হতে পারে কেউ ভাবতে পারতো না। পলতাশাকের ঘন জঙ্গল ছিলো ওখানে—পলতার মাঠ লোকে বলতো তাই। ময়ূরাক্ষীর তীর সন্নিহিত এ গ্রামের নাম তো ঐ মাঠের থেকেই হয়েছে পলতাডাঙা। পলতা শাক হোতো—আমড়া গাছ ছিলো, ওলকন্দ হোতো, ছিলো কুক্‌সিমার জঙ্গল—বসন্তকালে মুচকুন্দ ফুলের মিষ্টি গন্ধে সারা গাঁয়ের বাতাস ভরে থাকতো।

মাঝ বরাবর ডোবা ছিলো একটা তার ধারে পদ্ম বোষ্টমীর আখড়া ছিলো গাঁয়ের একটেরে। মন্দির ছিলো—তার চত্বর খানিকটা পরিষ্কার করে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে চড়কের মেলা বসতো—রীতিমতো লোকালয় একটা। গাজনের সময়ে গাজনের ফেরৎ কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসীরা ওই মাঠেরি ওপর আস্তানা গাড়তো। এখনো বালি খুঁড়লে তাদের ধুনির

সন্ধান মেলে বোধ হয় ; পোড়ো মন্দিরের খানদু'চার ভাঙা ইঁটও নজরে আসে।

তবে ??

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সব কিছু এমন নিশ্চিহ্নভাবে গ্রাস করলো বালির সমুদ্দুর ? কেন ??

আর যদিই বা করলো তো চারপাশের আর সব গ্রাম, জঙ্গল এমন কি পলতাডাঙা অবধি অক্ষত রইলো, শুধু ঐ মাঠটিই গেল নষ্ট হয়ে ?

কেমন করে ?

নবাগত কোনো পথিকের প্রশ্নের উত্তরে গ্রামবাসীরা একটা গল্প বলে। ঐ পদ্ম বোষ্টমীর আখড়াকে কেন্দ্র করে। যুবতী বৈষ্ণবী পদ্মা বড়ো স্বেচ্ছাচারী ছিলো সেকালে।

ওর বয়স অল্প. সুকণ্ঠী আবার চেহারাটিও সুন্দর। আখড়ার প্রৌঢ় মোহান্ত মহারাজের শেষ বয়সে ভীমরতি ধরেছিল। বুদ্ধিভ্রষ্ট মোহান্ত সেবাদাসী পদ্মাকে মাথার মণি করে রেখেছিলেন। সেই তাঁর কাল হোলো। সিদ্ধির শরবতের সঙ্গে ধুতরো ফুলের বীজ মিশিয়ে খাওয়ালে তাঁকে পদ্মা। বোধ হয় বৃদ্ধ মোহান্তকে তার আর পছন্দ হচ্ছিল না অথবা তার স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে তিনি আর পাল্লা দিয়ে চলতে পারছিলেন না। পথের বাধা হয়ে উঠছিলেন ক্রমশঃ। মোহান্তর আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে লোকে পদ্মাকে সন্দেহ করলে, শুধু সন্দেহ কেন, দৃঢ় ধারণা হোলো প্রত্যেকেরই। কিন্তু প্রমাণ কই ?

পদ্মা এবার বেশ জেঁকে বসলো।

আখড়ার মালিক হোলো ও নিজেই—নাম অবধি বদলে দিলে—পদ্মা বোষ্টমীর আখড়া।

তারপর আর কি ! আগের দিনের স্বেচ্ছাচারী পদ্মা এবার অনাচারী হয়ে উঠলো। বাঁধন রইলো না আর কোনো দিকে। বৈষ্ণবদের

ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ, তিনি নিরীহ ব্যক্তি, প্রেমলীলা নিয়েই ব্যস্ত আছেন, সাত পাঁচেও রা করেন না কিন্তু আখড়ার পাশেই মা বিশালাক্ষীর মন্দির, তিনি জাগ্রতা দেবী, তিনি কেন অত ব্যাভিচার সহ্য কয়বেন ?

মাস ছয়েকও গেল না মোহান্ত মোহারাজের মৃত্যুর পর। একদিন ভোরের দিকে পদ্মাকে সারা গাঁয়ের লোক দেখলে আখড়ার উঠোনের তেঁতুলগাছের ডালেতে ঝুলতে—শনের দড়িটা গলায় চেপে বসে নীল হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু নষ্টা মেয়েমানুষের রীত চরিত্তিরই আলাদা।

মরেও পদ্মা না শান্তি পেলে নিজে না রেহাই দিলে গাঁয়ের লোকেদের। চেপে বসে রইলো গাঁয়ের ঘাড়েতে। প্রায়ই ছোটোখাটো জ্বালাতন উপদ্রব করতে লাগলো এদিকে ওদিকে।

শেষে একদিন চরম হোলো।

কোনো ঝিয়াড়ী বৌয়ের সুখ সৌভাগ্য পদ্মা কোনোমতেই সহ্য করতে পারতো না ইদানীং।

মজুমদারেরা তখন বেশ বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ ঘর পলতাডাঙায়—এখন পড়তিদশা হলেও তখন অবস্থা খুব ভালো ছিলো। দুই ছেলের সবে বিয়ে হয়েছে একসঙ্গে—অল্পবয়সী সুন্দরী দুই বৌ এনেছে ঘর বসত করাতে—সুখ সৌভাগ্য একেবারে উছলে পড়ছে ওদের চতুর্দ্দিকে।

সুখ সৌভাগ্যই বটে !

শাশুড়ী মেয়ের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। যাবার সময়ে বলে গিয়েছিল—সন্ধেবেলা ষাঁড়া ষষ্ঠিকে নতুন গুড় আর পাটালি নিবেদন করে দিতে। কিন্তু ছেলেমানুষ নতুন বৌ দুটি একে, তায় আবার শাশুড়ীও চলে গেল বেড়াতে—সংসারের পাঁচ কাজের চাপে একেবারে ভুলে গেল সেকথা।

মনে পড়লো যখন তখন রাত ঘন হয়ে এসেছে—ঘরের পাট সব

চুকিয়ে তখন শুতে যাবার সময়। মা গো, শাশুড়ীর কাছে কাল বলবে কি!

অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জায় পড়ে, আবার ভুলে যাওয়ার অপরাধে বকুনি খাওয়ার ভয়েও হয়তো বা, কাউকে কিছু না বলে বৌ দুটি একা একাই খিড়কি দোর দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। পুকুরের ধার দিয়ে গিয়ে কানাচে ষাঁড়া ষষ্ঠিকে নিবেদন করে ফিরছে—দেখলে একটি বৌ ডাকছে হাতছানি দিয়ে। ঃ পলতার মাঠের ধারে আখড়াতে যাত্রা হচ্ছে, চ' শুনবি চ'। খুব ভালো পালা।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বৌ দুটি চললো পথপ্রদর্শিকার পিছন পিছন। অত রাত নেমে গেছে তখন, সঙ্গে কোনো পুরুষ মানুষ নেই, একলা একলা হেঁটে হেঁটে মাঠ ভেঙে যাত্রা শুনতে যাওয়া, কি উপলক্ষ্যেই বা যাত্রা হচ্ছে সেখানে এসব কোনো কথাই তাদের তখন আর মনে এলো না। নিশিতে যখন পায় তখন অমনই হয়। ভিন্ গাঁয়ের মেয়ে তারা সবে ঘর বসত করতে এসেছে শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ে। কেমন করে জানবে বলো এ গাঁয়ের ব্যাপার স্যাপার।

যাত্রা শোনার সখ মিটলো ভালো ভাবেই। সকালবেলা ভগ্নপ্রায় আখড়ার উঠোনে তাদের দেহ পাওয়া গেল—ভয়াবহ আতঙ্কের ছাপ সারা মুখে, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে—পরণের নতুন শাড়ী ফালি ফালি করে ছেঁড়া, ধনুকের মতো বাঁকানো ফ্যাকাশে দেহ হতে যেন কে নিঃশেষে সব রক্তটুকু শুষে নিয়েছে। গাঁয়ের লোকেরা পরামর্শ করে গঙ্গায় বাবা ভূতনাথের পায়ে পিণ্ড দিয়ে এলো মোহান্ত, পদ্মা আর বৌ দুটির নামে—অপঘাত মৃত্যু তো সবারি!

তারপর হতে আর বিশেষ কোনো উপদ্রব হয় নি। কিন্তু বছর পাঁচেক না যেতে যেতেই পলতার মাঠের দশা অমনিধারা হয়ে গেল—কোনো পাপ না করেই অকারণে অসময়ে অপঘাত মৃত্যু বরণ করে নিতে হোলো যে বৌ দুটিকে তাদেরি অভিশাপের উষ্ণ নিঃশ্বাসে পুড়ে

আঙার হয়ে গেল সারা মাঠ। পলতার মাঠের নাম বদলে তারপর থেকেই তো 'বৌমারীর ডাঙা' হয়েছে।

নবাগত পথিকের দুই চোখের পাতা হয়তো আর্দ্র হয়ে আসবে সেই অল্পবয়স্কা, ভীরু দুটি নির্দোষ গ্রাম্য বধূর প্রতি সহানুভূতিতে—কত শখ হয়তো সে নববিবাহিতাদের মিটলো না—সবে জীবনের মধুর আস্বাদ পেয়েছিলো বেচারীরা!

কিন্তু না, হয়তো আগন্তুকদের প্রাথমিক কৌতূহল মেটাবার উদ্দেশ্যেই ও কাহিনীটি বানিয়ে রাখা হয়েছে। নবাগত পথিক যখন আরো অনেক ঘনিষ্ঠ আর অন্তরঙ্গ হয়ে আসবে গ্রামবাসীদের সাথে—পলতাডাঙার সুখদুঃখের সাথে জড়িয়ে ফেলবে নিজেকে, যখন আর সে নবাগত পথিক মাত্র থাকবে না তখনি গ্রামের অতিবৃদ্ধ অধিবাসীদের মুখ হতে বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপে কোনো এক জমাটি সান্ধ্য-মজলিসের রহস্যঘন পরিবেশে উদ্ঘাটিত হবে পলতাডাঙা গ্রামের গোপন তথ্য—বৌমারী মাঠের ইতিহাস।

পদ্মা বোষ্টমী নয় গো মোটেই, ওই মাঠের আজকের এহেন দুর্দশার মূলে আছে এক বেদেনী।

বেদেনী?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, চমকে উঠছো কেন? বেদেনীই।

তবে চন্দনা বেদেনী আর সব সাধারণ বেদেনীদের মতো ছিল না। সে খোঁপায় গুঁজতো রঙ্গন ফুলের স্তবক, মেহেদী পাতার রঙে আঙুল রাঙাতো—উগ্র পিঙ্গলবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী বেদেনীর সারা দেহ হতে মাদকতার বৃষ্টি হতো যেন।

বছর ত্রিশেক আগেকার কথা।

তখন পলতাডাঙার অবস্থা আজ যেমন দেখছো এ রকম ছিলো না মোটেই। পলতাডাঙা তখন একটা নামী পরগণা—পলতাডাঙার

জমিদার চৌধুরী বংশের খাসমহাল। বিদায়ী মালক্ষ্মী চৌধুরীর কোষাগারে ঐ শেষ মূল্যবান সম্পত্তিটুকু গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন।

তখন পলতা ডাঙায় আধিপত্য করছেন অধুনা-লুপ্ত চৌধুরী বংশের অষ্টম পুরুষোদ্ভূত জমিদার রায় শ্রীসূর্য্যশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়। কিন্তু তার আগে সাবেক আমলে ফিরে যাওয়া দরকার একটু।

চৌধুরী বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা রায় শ্রীশ্যামাশঙ্কর চৌধুরীর আমল হতেই ময়ূরাক্ষীর তীরে তীরে আশে পাশের পাঁচখানা গ্রাম জড়িয়ে মৌজা পলতা ডাঙা মহাল তখন বেশ সমৃদ্ধিশালী। জমিদার বংশের ইতিহাস যেমন হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

প্রথমে শুধু সঞ্চয়, মাঝে ভোগের পালা, অবশেষে ত্যাগ। শ্যামাশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় অত্যন্ত সঞ্চয়ী ছিলেন। তার পরেও দুপুরুষ ধরে লক্ষ্মীকে বেঁধে রাখার তোড়জোড় চললো। মাঝে ভোগ অর্থাৎ চৌধুরী বংশের চতুর্থ পুরুষ রামশঙ্কর চৌধুরী অল্প বয়সেই বিরাট জমিদারীর মালিক হয়ে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়লেন। ভোগের জেরই চললো পরবর্ত্তী কাপুরুষে। ভোগের ফলে ত্যাগ আসে শেষে। মূল্যবান লাটগুলি একে একে ত্যাগ করবার দরকার হতে থাকলো অথবা তারা নিজেরাই ত্যক্ত হয়ে খসে খসে পড়তে লাগলো। ষষ্ঠ পুরুষে দুই ভ্রাতা হরিশঙ্কর ও গৌরীশঙ্কর চৌধুরী এত বিলাসী হয়ে উঠলেন যে পলতা-ডাঙাকে তাঁরা আর বাসযোগ্য মনে করতে পারলেন না—যে অট্টালিকায় তাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রত্যেকে বাস করে গেছেন সেই প্রাসাদ তুল্য পাঁচ-মহলা বাস্তুভিটা ত্যাগ করে শহরে গিয়ে নূতন গৃহনির্ম্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। সপ্তম পুরুষ অর্থাৎ বর্ত্তমান জমিদার সূর্য্যশঙ্কর চৌধুরীর পিতারাও ছিলেন দুই ভাই, নিত্যশঙ্কর ও চিত্তশঙ্কর। এঁদের মধ্যে চিত্তশঙ্করই চৌধুরী বংশের ব্যতিক্রম হয়ে জন্মালেন—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। শিশুকাল হতেই তিনি ভোগবিলাসে উদাসীন—বরং বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর

সমধিক আসক্তি দেখা গেল। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের দিকে ঝোঁকও তাঁর বেড়ে চলতে লাগলো ক্রমশঃ। চৌধুরী বংশে প্রথম তিনি দর্শনশাস্ত্রে সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হলেন আবার চৌধুরী বংশে সর্বপ্রথম তিনিই বিদ্যাসাধনা সাঙ্গ হলে যৌবনেই সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হিসাবে তাঁর নামও যথেষ্ট সুপরিচিত।

চৌধুরী বংশের শেষ বংশধর বর্ত্তমান জমিদার রায় শ্রীসূর্য্যশঙ্কর চৌধুরী। ইনি বিপত্নীক। নয়ানজোড়ের রাজার ছোটো মেয়ের সঙ্গে কিশোর বয়সেই এঁর বিবাহ হয়েছিল বংশের প্রথা অনুযায়ী, কিন্তু সইলো না। বিবাহের অষ্টমঙ্গলার মধ্যেই নববধূ পিতৃগৃহে ওলাউঠায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেল।

সূর্য্যশঙ্কর তখন ছাত্র। জ্যোতিষী গণনা করে বললে—সপ্তমাধিপতি রাহু; জাতকের পত্নীস্থান বর্ত্তমানে তিন বৎসর পর্য্যন্ত নিতান্ত অশুভ।

পিতা নিত্যশঙ্কর মনস্থ করলেন পুত্রের ছাত্রজীবন সমাপ্ত হলে দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা করবেন। ততদিনে ফাঁড়ার মেয়াদও শেষ হবে। কিন্তু ততদিনে আর একটা ব্যাপারও ঘটে গেল অর্থাৎ সূর্য্যশঙ্কর সাবালক এবং পরিণতবয়স্ক হয়ে উঠলেন—নিজের বিয়ের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিলেন। বিয়েতে মত দেওয়ার কোনো লক্ষণ না দেখে বংশ লোপ হবার আশঙ্কায় নিত্যশঙ্কর পুত্রের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন কিন্তু সূর্য্যশঙ্কর অটল অচল। অমিতাচারের ফলে চৌধুরী বংশের উর্দ্ধতন কয়েক পুরুষের কেউই দীর্ঘায়ু-লাভ করেননি, নিত্যশঙ্করও কিছু সে নিয়মের ব্যতিক্রম হলেন না। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সেই তাঁর ওপারে যাবার ডাক এলো—পুত্রের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়াটুকু করে যাওয়ার অবকাশ মিললো না।

গৃহিণী প্রভা দেবী স্বামীর মৃত্যুর পর ৺কাশীধামের আশ্রমে চলে

গেলেন ; ভীরু, ব্যক্তিত্বহীনা অত্যন্ত সহিষ্ণু প্রকৃতির নারী তিনি চিরকাল চৌধুরী বংশের সমস্ত অনাচার অত্যাচার সহ্য করে এসেছিলেন, নীরবে তিনি আবার নিজের পেটের সন্তান, চৌধুরী বংশের শেষ রক্তধারকের অবাধ্যতা সহ্য করলেন এবং যে বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তাকে আশ্রয় করে থাকার চেয়ে বাবা বিশ্বনাথের চরণাশ্রয়কে শ্রেয় জ্ঞান করে নীরবেই তিনি সংসার হতে বিদায় নিয়ে গেলেন। সূর্য্যশঙ্করও কোনো আপত্তি করলেন না—প্রভা দেবী চলে যাওয়ার পরে তিনিও শহরের বাড়ীঘর একেবারে বিক্রী করে ফেলে চলে এলেন দেশে স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্মে। সঙ্গে এলো তাঁর কনিষ্ঠা বীণাবতী আর বীণাবতীর জ্যেষ্ঠা রমাবতীর ফুটফুটে সুন্দর বছর সাত আটের একটি ছেলে—রঞ্জন। সূর্য্যশঙ্কর দত্তক প্রথার একান্ত বিরোধী ছিলেন। বিবাহের পাচ বৎসরের মধ্যে পরপর চারটি সন্তানের জন্ম দিয়ে স্বাস্থ্যভগ্ন হয়ে অকালে রমাবতী মারা যায়—মারা যাবার আগে কোলের ছেলেটিকে প্রাণপ্রিয় দাদার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিল রমা। সূর্য্যশঙ্করও ওকে ভালোভাবে মানুষ করবার চেষ্টা করছেন।

পুরোণো বাড়ী সুসংস্কার করিয়ে বেশ জাঁকজমক আর আড়ম্বর সহকারেই জমিদার এলেন বাস করতে—গ্রামে এলেন তিনি ভালোবেসেই, মাত্র কয়েকবার চোখে দেখা পিতৃপুরুষের বাস্তভিটার প্রতি টানে, তাঁর প্রজাদের প্রতি মমতায়, তাদের মধ্যে বাস করবার জন্মে এলেন তিনি সৎউদ্দেশ্যেই কিন্তু প্রজারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। উর্দ্ধতন জমিদারেরা খুব অত্যাচারী ছিলেন না কিন্তু স্বেচ্ছাচারী আর অনাচারী ছিলেন প্রচণ্ডরকম—প্রজাদের তাই সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে কাল কাটাতে হোত। গ্রামের বাস উঠিয়ে যখন তাঁরা একেবারে চলে গেলেন, প্রজারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। তাই সূর্য্যশঙ্করকে দেখে আবার সেই ক্ষমতাবানের হাতে খেয়াল-খুশিমতো উৎপীড়িত হবার

পুরোনো শঙ্কা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো তাদের মধ্যে।

শহরের আমোদ সব শেষ হয়ে গেছে—এখন নব আনন্দের রসের জোগান দেওয়ার প্রয়োজনে তাদের শোষণ করতেই জমিদারের শুভাগমন হয়েছে এই ধরণের একটা মনোভাব তাদের হওয়া বিচিত্র নয়। সূর্য্যশঙ্করের আড়ম্বরের ঘটা দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল আরো বেশী।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই দুপক্ষই পরস্পরের স্বরূপ খানিকটা চিনে নিলে। সূর্য্যশঙ্কর চিনলেন তাঁর প্রজাদের, বুঝলেন্ এরা সাধারণ গ্রাম্য অধিবাসীই। ভীরুপ্রকৃতি খানিকটা বা দলাদলি আর পরচর্চ্চাপ্রিয় তবে কর্ম্মবিমুখ নয়—দেব, দ্বিজ ও জমিদারে ভক্তিপরায়ণ।

আর প্রজারা বুঝলে—ঠিক বুঝতে পারলে না জমিদারের বিচিত্র চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারার মতো তীক্ষ্ণ মেধা তাদের ছিলো না তবে মোটামুটি বুঝলে মানুষটা নির্ব্বিরোধী। এটুকু তারা ঠিকই বুঝেছিল।

সূর্য্যশঙ্কর সত্যিই বিচিত্র প্রকৃতির লোক। তাঁর মধ্যে পূর্বতন পুরুষের বিলাসস্পৃহা আছে আবার পূর্বতম পুরুষের সঞ্চয়েচ্ছাও রয়েছে। নিত্যশঙ্কর ও চিত্তশঙ্কর, দুই ভাইয়েরই সমন্বয় ঘটেছে তাঁর মধ্যে—ফলে চৌধুরীবংশের মতো জেদী, একগুঁয়ে হয়েছেন তিনি আবার কাকার মতো বিদ্বান এবং বিদ্যানুরাগী হতেও বাধা ঠেকেনি কিছু। ধর্ম্মের দিকেও বেশ ঝোঁক আছে; ধর্ম্মের বিষয়ে জানবার বুঝবার আগ্রহ আছে অথচ নাস্তিকদেরও ভক্তি করেন।

বিরুদ্ধবাদিতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত তাঁর চরিত্র।

রাগ যখন তাঁর একবার হয় তখন একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। চৌধুরী বংশের বিখ্যাত জেদ তাঁর শিরায় শিরায় বইছে—কৌমার্য্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জিদে তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ

করলেন না, মা বাবার মুখের দিকে তাকালেন না, জিদের পরিপোষণে বংশের কথা ভাবলেন না। উত্তরকালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার বাসনাও হয়তো তাঁর অবচেতন মনের কোণে সুপ্ত ছিলো, কে বলবে? নিজের মতের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত অবুঝ ও অসহিষ্ণু, নিজে যা বুঝবো তাইই ঠিক—সমস্ত পৃথিবী বিরুদ্ধাচরণ করলেও নিজের রায় প্রত্যাহার করতে তিনি রাজী নন যেহেতু সে রায় দেওয়া হয়েছে তাঁর তরফে বহু ভাবনা চিন্তার পরে। নিজের কথার দাম দেওয়ার বিষয়েও তাই অত্যন্ত সচেতন তিনি। কিছুটা খেয়ালী আর অত্যধিক মাত্রায় আত্ম-কেন্দ্রিক—সব মিলিয়ে মোটামুটি এই সূর্য্যশঙ্করের চরিত্র—ঠিকমতো এত জটিল চরিত্র এঁকে তোলা সম্ভব নয়।

প্রজারা তাঁর আত্মকেন্দ্রিকতাকে ভুল বুঝলে স্বার্থপরতা হিসাবে। তিনি চাইলেন প্রজাদের সঙ্গে মিশতে, প্রজারাও চাইলো তাঁর সাথে মিলতে যখন দেখলো তিনি নির্ব্বিরোধী; কিন্তু হৃদ্যতা প্রকাশ করার পথ সূর্য্যশঙ্কর জানেন না। ব্যক্তিত্ব আর বৈশিষ্ট্যের এমন নিরেট গণ্ডী দিয়ে তিনি ঘেরা যে সাধারণ লোকে তাঁর নাগালই পেল না। সূর্য্যশঙ্কর তাঁর নিজের গলদ বুঝতে পারলেন না, কেউ তা বুঝতে পারেও না—প্রজারা দেখলে তাদের জমিদার দাম্ভিক তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য। তাঁকে স্বার্থপর ভাববার আরো কারণ আছে তাদের পক্ষে।

তিনি এলেন, নিজের বাসস্থান সুচারুরূপে মেরামত করলেন—ঘোড়া চলাচলের ভালো রাস্তা ছিলো না বলে নিজের ঘোড়া চালাবার জন্যে পলতার মাঠের মধ্য দিয়ে লাট বেগমপুর অবধি ভালো সড়ক তৈরী করে দিলেন—পথের দুধারে ঘোড়ার খাবার জন্যে জলের ব্যবস্থা করলেন কিন্তু করলেন না কিছু প্রজাদের জন্যে! প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে, প্রজাদের কল্যাণের জন্য গ্রামউন্নয়নে সাহায্য করতে

তিনি অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন—হাতে তাঁর সত্ত সত্ত বাড়ী বিক্রির নগদ টাকা ছিলো, মনে ইচ্ছাও ছিলো প্রচুর কিন্তু তিনি জমিদার—জমিদার সুলভ স্বভাবজ আত্মাভিমানও তাঁর যথেষ্ট; তিনি কেন যাবেন প্রজাদের কাছে যেচে তাদের কল্যাণের পসরা বইতে! প্রজারাই আসবে তাঁর দরবারে অভাব অভিযোগ নিয়ে—তিনি স্মিতহাস্যে প্রসন্ন উদারতার সঙ্গে তাদের সব দাবী দাওয়া, প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন।

প্রজাদেরও প্রয়োজন ছিলো অনেক কিছু, অভাব ছিলো যথেষ্ট কিন্তু যে দাম্ভিক জমিদার নিজে থেকে তাদের জন্যে কিছু করলেন না স্বার্থপরের মতো নিজের সুখ সুবিধার ব্যবস্থাই করলেন কেবল, তাদের মুখের দিকে একটিবার তাকালেন না, তাঁর দরবারে নিজেরা এগিয়ে গিয়ে ভিক্ষা চাইতে তাদের আত্মসম্মানে বাধলো—হলেনই বা তিনি আশ্রয়দাতা রাজা। এমনি ভাবে পরস্পরের কাছ হতে দুইপক্ষই দূরে সরে রইলো। মোট কথা—এতকাল পরে দেশে ফিরে স্বগ্রামের অধিবাসীদের জমিদারের ভালোই লাগলো—প্রজাদেরও ভালো লাগলো নির্ব্বিরোধী, সংযমী, রূপবান, বিদ্বান জমিদারকে কিন্তু ভালোবাসা এলোনা কোনো তরফেই—অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হবার পক্ষে বিস্তর বাধা।

সূর্য্যশঙ্করের আত্মমুর্খী স্বভাব ছাড়াও আর একটা বাধা—সে হোলো তরুণী বীণাবতী।

শহর থেকে সত্ত আগত জমিদারের পরিবারের মধ্যে এই মেয়েটিকে তারা সহ্য করতে পারলে না। উচ্ছৃল, চঞ্চল প্রকৃতির অল্পশিক্ষিতা মেয়ে দিদিরাণী বীণাবতী শহরে মানুষ হয়েছে, জমিদারী আদব কায়দা শেখেনি—পর্দ্দাপ্রথা মানে না। অল্প বয়সে রমাবতীর বিয়ে হয়ে যাওয়াতে কোলের মেয়ে বীণাবতীই ছোটো পরিবারের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়েছিল—আদরে আদরেই সে নষ্ট হয়ে গেল না হোলো কোনো দিকে কোনো রকম শিক্ষা না আর কিছু। পিতা নিত্যশঙ্কর তার বিয়ে দিতে

ভয় পাচ্ছিলেন রমার অকাল মৃত্যুর পর—তিনি হঠাৎ মারা যাওয়ার পর সূর্য্যশঙ্করই বীণার অভিভাবক—তাঁর তো বীণুর বিয়ের কথা মনেই এলো না। ছোটো বেলায় তিনি খানিকটা কাকার সাহচর্য্য পেয়েছিলেন। কাকা গার্হস্থাশ্রম ত্যাগ করে যাওয়ার পর আজ পর্য্যন্ত ঐ বীণাই তাঁর সব সাথীর অভাব পূরণ করে এসেছে। কাকা সন্ন্যাস নিয়েছেন, স্ত্রী নেই, পিতা মৃত, মা দূরে চলে গেছেন, রমাও মারা গেছে—সারা পৃথিবীতে এখন যত্ন-আত্তি করতে, ভালোবাসতে, আত্মীয় পরিজন বলতে ঐ মোটে একটা বোন—ওকে বিদায় করে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই তো ওঠে না।

সূর্য্যশঙ্করের মনে এ প্রশ্ন না উঠলেও গাঁয়ের লোকেদের মনে সর্বদাই এ প্রশ্ন উঠে আছে। পনেরো, ষোলো বছরের বয়স্থা ধিঙ্গী মেয়ে সব সময়ে নেচে বেড়াচ্ছে—গাঁয়ে কারুর ঘর হলে বুকের রক্ত জল হয়ে যেত, সমাজে পতিত হতে হোতো, রাজার ঘর বলেই অনায়াসে চলে যাচ্ছে, হুজুরের মুখের ওপরে কে কি বলবে? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে, বিশেষ করে বীণা সম্বন্ধে কোনো কথা কয়। বীণুর সম্বন্ধে সূর্য্যশঙ্কর পুরোপুরি অন্ধ একেবারে।

গাঁয়ের লোকের অসন্তোষ জমতেই থাকলো। এই সময়ে চৈত্র সংক্রান্তির মেলার হুজুক এলো দেশে—জমিদারের বাস করতে আসার মাস তিনেক পরেই। জমিদার প্রসঙ্গ ততদিনে পুরোনো হয়ে গেছে, তাঁদের সমালোচনাটাও একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, কিছুদিনের জন্যে সকলে তাঁদের কথাই ভুলে গেল। সারা বৎসরে এই একটা বড়ো উৎসব, আশে পাশের দু'দশখানা গ্রাম এরই মুখ চেয়ে থাকে। সমস্ত গাঁয়ের লোক আনন্দে মেতে উঠলো। বাবা ভোলানাথের পুজো হয়, মায়ের খুব ধুমধাম করে পুজো হয় ঐ দিনে উৎসবের কেন্দ্র তাইই—বাকী মেলাটেলা প্রভৃতির জের চলে আরো দিন সাতেক। এবারের মেলায়

ভিন গাঁ থেকে এলো বেদের দল—তাঁবু গেড়ে বসলো, খেলা দেখাবে। সেই দলেই ছিলো এই চন্দনা বেদেনী। আর ছিলো মোহন বেদে। কালো পালিশ করা আবলুষ কাঠ দিয়ে গড়া নিখুঁত অ্যাডোনিসের মূর্ত্তি, কাজলাঞ্জন দুটি চোখ, কালো চকচকে কোঁকড়া চুলের রাশ মাথায়—মোহন বাঁশীর মোহনিয়া সুরে লোককে পাগল করে দেওয়ার মন্ত্র জানে। লোকে বলতো চন্দনার সঙ্গে মোহনকে বড়ো মানাবে। কিন্তু দুজনে বনিবনা ছিলো না মোটে। এবারেও তাই তাড়াতাড়িই তারা পাততাড়ি গোটালে। অন্যবার কখনো সখনো এলে বেশ কিছুদিন থাকে এরা, এবারে মোহন আর চন্দনার সঙ্গে ঝগড়ায় আর তারা তিষ্ঠোতে পারলে না। দলের সঙ্গে মোহন গেল আর চন্দনা দল ছেড়ে রয়ে গেল এখানে। এ গ্রাম ওর ভালো লেগেছিল তাই রইলো ঐ পলতার মাঠের গাজন তলার খানিকটা জায়গা মাটি লেপে পরিষ্কার করে নিয়ে দুখানা কুঁড়ে তুলে। চমৎকার সাজিয়েছিল কুঁড়ে দুখানা। শিল্পীমন ছিলো ওর—রুচিবোধ ঠিক আর সব সাধারণ বেদেনীদের মতো নয় আগেই বলেছি। নিকিয়ে পুঁছিয়ে অল্প সরঞ্জাম দিয়ে পরিপাটি করে ঘর দুখানা সাজালে—গেরি মাটির আলপনা দিলে তার ছোট্ট গৃহস্থালীর সর্ব্বত্র, কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট উঠোনটিতে সন্ধ্যামণি আর দোলন চাঁপার চারা পুঁতলে—উঠানের দরজার ওপর দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে তুলে দিলে মালতী লতা।

তখন মেলা ভেঙে গেছে চলে গেছে সব লোক। উৎসবান্তের অবসাদে ঝিমোচ্ছে সারা গ্রাম। চন্দনার বাড়ীর পাশ দিয়েই লাট বেগম পুরের নতুন সড়ক। খুব ভোরে উঠেছে চন্দনা—স্নান ক'রে উঠোনে ছাগলকে যব খাওয়াচ্ছে এমন সময়ে নজরে পড়লো নতুন সড়কে লাল ধুলো উড়ছে দূর হতে। কৌতুহল ভরে ও দেখতে লাগলো লাল ধুলো উড়িয়ে কি হচ্ছে! দেখলে মিশমিশে কালো রঙের প্রকাণ্ড তেজী ঘোড়া যেন

উড়ে আসছে—পায়ের খুরে খুরে রাঙা ধূলোর ঘূর্ণি সৃষ্টি হচ্ছে আর ঘোড়ার পিঠে যোগ্য সওয়ারীর দীপ্ত গৌরবর্ণ আলো ছিটিয়ে যাচ্ছে পথের দুপাশে। বেদেনী চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল !

সূর্য্যশঙ্করকে চন্দনা এই প্রথম দেখলে। মেলার ভিড় ছিলো বলে নির্জ্জনতাপ্রিয় সূর্য্যশঙ্কর সংক্রান্তির দুদিন আগে হতেই তাঁর অতিপ্রিয় প্রাতর্ভ্রমণ ত্যাগ করেছিলেন। মেলার দিকে তিনি যাননি বিশেষ। গ্রামের লোকেরা তাদের প্রধান উৎসবে সসম্ভ্রমে জমিদারকে নিমন্ত্রণ করেছিল—মায়ের পূজার সময়ে তিনি উপস্থিতও ছিলেন, পুরোহিতকে দুটি মোহর প্রণামী দিয়ে প্রণাম করেছিলেন কিন্তু সে পূজাপ্রাঙ্গনে বেদেনীর থাকবার কথা নয়।

তারপর হতে নিত্য এই ব্যাপার ঘটতে থাকলো। সারাদিন ধরে বেদেনী উন্মুখ হয়ে থাকে রাত্রিপ্রভাতের প্রতীক্ষায়—নিজের হাতে নতুন সড়কের 'পরে পড়ে থাকা ডালপালা পরিষ্কার করে রাখে যাতে তার আরাধ্যের অসুবিধা না হয় এতটুকু. তারপর মাঝরাত হতে উঠে এসে উঠোনে বেড়ার আগল ধরে অনিমেষ দৃষ্টিতে পথের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—অতি প্রত্যুষে সূর্য্যশঙ্কর অশ্বারোহণে বেরিয়ে যান, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ফিরে আসেন—তৃষিতা বেদেনী দিনে একবার দর্শনও ব্যর্থ হতে দেয় না। সূর্য্যশঙ্কর কখনো কোনো-দিকে তাকান, না একদিন কেবল একটিবারের জন্যে বেদেনী তাঁর চোখে পড়ে গিয়েছিল—নীলাঞ্জনা ছিলছিলে দীঘল নাগিনীর মতো দেহ—রূপোর হাঁসুলী গলায়, রূপোর খাড়ু হাতে, রূপোর মল পায়ে যেন ময়ূরাক্ষীর মূর্ত্তিধারিকা এই মেয়েটির দিকে সূর্য্যশঙ্কর একটিবার তাকিয়েছিলেন বিস্মিত দৃষ্টিতে তারপর ফিরে তাকিয়েছিলেন নতুন যেন মাটি ফুঁড়ে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা পরিচ্ছন্ন কুটিরটির পানে। তিনি চলে যাবার পর বেদেনী ঘরে ফিরে এসে সেদিন হঠাৎ ঝর ঝর করে

চোখের জল ফেলে বুক ভাসিয়ে দিলে; তার ঠাকুরের উদ্দেশ্যে মাথা কুটলে বারবার কোন্ অসহ্য মর্ম্মবেদনায় কে জানে!

চন্দনা ঐ তল্লাটে একলা ছিলো না—বেদের মেয়ে হয়েও ও একা থাকতে পারতো না। তার নতুন বাড়ীর সন্নিকটেই বিশালাক্ষী দেবীর বৃদ্ধ পূজারী থাকতেন, তাঁর চোখে কোনো কিছু পড়েনি। কিন্তু বাউরী-দের একটি মেয়ে চন্দনার কাছে রাত্রে শুতো—সে চন্দনার সম্পর্কে সন্দেহাকুল হয়ে উঠলো। সেদিন, সূর্য্যশঙ্কর চলে গেছেন সেইমাত্র, চন্দনা দাঁড়িয়ে আছে ধ্যান-মগ্না হয়ে, নিঃসাড়ে পিছন থেকে এসে কুসুম চন্দনার কাঁধে হাত রাখলে। চন্দনা চমকে উঠলো—মুখ ফিরিয়ে তাকালো। বিস্মিত ভাবে কুসুম বললে,ঃ হ্যাঁরে, ও তো আমাদের রাজাবাহাদুর গেলেন গো?—চন্দনা সূর্য্যশঙ্করের পরিচয় জানতো না—কিন্তু জেনেও একটু আশ্চর্য্য হলোনা–রাজাবাহাদুর যে হবেন এ তো এক রকম জানা কথাই। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেব স্বয়ং হলেও আশ্চর্য্য হবার ছিলোনা কিছু। কিন্তু কুসুম ওইখানেই থামলো না, গড় গড় করে বলে চললোঃ তাই তো বলি বনের মধ্যে এ শবরীর তপিস্যে কিসের লেগে? রাত দুপুরে উঠে সোমত্ত মেয়ে কোথায় অভিসারে যায়—তক্কে তক্কে ছিনু ধরবার লেগে। তা ওমা কোথায় যাব গো—এ যে একেবারে চাঁদে হাত! আমাদের দেবতুল্যি জমিদার—পথের মেয়ের পানে ফিরে তাকায় না, তুই কি করে জানবি লো—ভিন্ন দেশের লোক? ঐ মানুষকে টলাবার চেষ্টা! কোথায় যাব মা!……আর বেদের মেয়ে তুই কি বলে অপবিত্তির মুখখানা পাতঃকালেই দেবতাকে দেখাস?

চন্দনার কানে সব কথা যায়নি, স্বপ্নাবিষ্ট ভবে ও বললেঃ উনি তো আমায় কখনো দেখেন না। তুইই তো বললি পথের মেয়ের পানে ফিরে তাকান না।

কিন্তু কুসুম তবু ছাড়লে না অনেক গাল-মন্দ করলে। সকালের

মিষ্টি পরিবেশটা তেতো হয়ে উঠলো। রাতের আবেশ থেকে যাওয়া ঘুম জড়ানো প্রথম উষা লগ্নে দেবোপমকান্তি সূর্য্যশঙ্কর দুরন্ত ঘোড়া হাকিয়ে যেতেন—সব মিলিয়ে চন্দনার মনে হোতো যেন স্বর্গীয় ঘটনা একটা ঘটছে কোনো—যেন ও মানুষটি পার্থিবলোকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কুসুম তাকে পৃথিবীর ধূলোয় টেনে নামালো।

চন্দনার সারা মনটা বিষাক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু তবুও চন্দনা তার অভ্যাস ছাড়তে পারলো না।

সূর্য্যশঙ্করের লক্ষ্য হোলো এতদিনে। একান্ত জনবিরল পথে দিনের পর দিন এই যে একটিমাত্র লোকের অমনতর একনিষ্ঠ দৃষ্টি অর্ঘ্যের নিবেদন—অন্য যেকোনো লোকের চোখে অনেকদিন আগেই পড়তো নেহাৎ সূর্য্যশঙ্করের নজর মাটির পানে পৌঁছয় না। কেমন এক বিচিত্র দৃষ্টিতে তিনি চন্দনার দিকে তাকালেন—ঘৃণা আর অবজ্ঞার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ সে দৃষ্টিতে। রোজই যাওয়ার সময়ে আসার সময়ে দুবারই এক ভাবে মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকে। আচ্ছা জ্বালালে তো বেদেনীটা !! তাঁকে কি ঘোড়া চালাবার জন্যে আবার আরেকটা নতুন রাস্তা তৈরী করতে হবে নাকি ?

দিনের পর দিন তাঁর বিরক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। হুট্ বলতে এই যে একেবারে গাঁয়ের মাঝখানে এসে তুই ঘর তুলে বসলি একটা বেদেনী—না তাঁর একটা অনুমতি নেওয়া না খাজনা না কিচ্ছু, যাকগে তিনি তো কিছু বলেননি কিন্তু এ আবার কি উৎপাত ? আছিস্ নিজের ছাগল কুকুর নিয়ে তাই থাক না, তা নয় একি দারুণ আস্পর্দ্ধা ?

ভুল করলো চন্দনা। সূর্য্যশঙ্করের দৃষ্টিকে অনুধাবন করতে পারলো না ও ঠিক মতো। মানুষ হিসাবে ভজনা করলেই বোধ হয় খুসী হবে এ লোক। জাত বেদেনী ওর মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো—পূজারিণীর গলা টিপে মেরে জন্ম নিলো স্বৈরিণী। এবার থেকে অন্য ধরণের

অভিনয় আরম্ভ হোল—প্রতিদিন নতুন নতুন ছলাকলার অবতারণা দেখে অতিমাত্রায় বিরক্ত হয়ে সূর্য্যশঙ্কর তাঁর আজন্মকালের অভ্যাস প্রাতর্ভ্রমণ ত্যাগ করলেন।

কিন্তু তিনি ত্যাগ করলেও চন্দনার তাঁকে ত্যাগ করলে চলবে না। চন্দনা কেমন হিংস্র হয়ে উঠলো—সূর্য্যশঙ্করের পিছু পিছু ও ধাওয়া করলে গ্রামের অন্তঃস্থলে—এতদিন যে গ্রাম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলো সে।

পলতা ডাঙার লোকেরা চন্দনার বাস করতে আসাটা একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি। ছোঁড়াগুলোর কাঁচা মাথা চিবিয়ে খাওয়াই এদের ব্যবসা—তুক্ গুণের রাণী—তার ওপর সোমত্ত বয়স, চেহারাটা ভালো। জমিদারের কাছে আবেদন করে ওকে উচ্ছেদ করবার জল্পনা কল্পনাও চলছিল কিন্তু জমিদারের কাছে সহজে এরা এগোতে চায় না বলে ব্যাপারটায় একটু দেরী পড়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ওরা লক্ষ্য করলে মেয়েটা গাঁয়ের একটেরেতেই রইলো—বেশ একটা গেরস্ত ঘরের মেয়ের মতো ভাবসাব—গ্রাম সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হয়ে রইলো। দুটো বাগ্দীপাড়ার ছেলেই বরং একদিন সন্ধ্যার দিকে ওর ঘরের কাছে ঘুরঘুর করছিলো কুসুম তাদের চেলাকাঠ নিয়ে তাড়া করেছিল। মন্দিরের সেবায়েৎও বললেন মেয়েটার চালচলন খুব ভালো। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার—মেলার সময়ে ঐ মোহন বলে বেদেদের ছেলেটা চন্দনার কাছে দাবী করেছিল অনেক কিছু—চন্দনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে দল ছেড়ে চলে এলো এখানে। ঘটনাটা তার চরিত্রকে বেশ খানিকটা উঁচু করে তুলেছে। সকলেই বললো—সব জিনিষেরই ভালোমন্দ দুইই আছে কোনো কিছুই একেবারে মন্দ হয় না—কে জানে হয়তো বা ও কোনো ভালোঘরেরই মেয়ে, মানুষ হয়েছে বেদেদের দলে। কিন্তু এখন আবার ওকে সাপের খেলা দেখাবার জন্তে গ্রামের মধ্যে আসতে দেখে সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

কত রকমের ছলনাই না ওরা জানে—হয়তো প্রথমটা ভিজে বেড়াল সেজে বসেছিল—আস্তানা গাড়বার সুবিধা হবে বলে—এখন মুখোস খসাচ্ছে ক্রমে ক্রমে।

জমিদারের অন্তঃপুরে ও ঘুরঘুর করতে আরম্ভ করলে—রঞ্জন ও বীণাবতীকে হাত করে জেঁকে বসবার মতলবে। বীণাবতীকে ও চিনে নিয়েছে, অত্যন্ত উচ্ছল হালকা প্রকৃতির আদুরে রাগী মেয়ে—মাথায় নিজস্ব বুদ্ধি নেই বিশেষ। দাদার বিপরীত সর্বাংশে। কিন্তু বীণাবতীও তাকে বিশেষ আমল দিলে না। যতই হোক ধমনীতে বইছে খাঁটি অভিজাত রক্ত—নীচজাতীয়া বেদেনীকে বেশীদিন সহ্য করা সম্ভব হবে কি করে তার পক্ষে? প্রথম কিছুদিন, ঔৎসুক্যভরে ওর খেলা দেখলে, গল্প টল্প শুনলে আরো কিছুদিন তারপর আর নতুনত্ব, আকর্ষণের কিছু রইলো না—রোজ রোজ ওর আসাতে বিরক্ত হয়ে একদিন তাড়িয়ে দিলে অভদ্রভাবে।

গ্রামের লোকে একজোট হয়ে লাঞ্ছনা করলে ওকে। সকলের কাছে তাড়িতা হয়ে বেদেনী নিজের ঘরে ফিরে এলো!

ঘরদোর বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে একেবারে—পালিত জীবগুলি অসুস্থ হয়ে পড়েছে—কোনোদিকে নজর দেয়নি ও কতদিন! কুসুম রাগ করে চলে গেছে—সূর্য্যশঙ্করও এপথে যাওয়া আসা ত্যাগ করেছেন সে আজ কতদিন হোল? বীণাবতী আজ তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে, গ্রামের লোকেরা অসহ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে অকারণে—সহসা মনে হোলো এত বড়ো পৃথিবীতে কোনোখানে এককণা দরদ রাখা নেই তার জন্যে। ব্যর্থতার আক্রোশে ওর দুচোখ জ্বলে উঠলো। দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো চন্দনা—আছে, আছে, জমিদার সূর্য্যশঙ্করকে জয় করবার অস্ত্র তার মতো নগণ্যা বেদেনীর হাতেও আছে।

এর কিছুদিন পরে হঠাৎ মোহন কোথা থেকে এসে জুড়ে বসলো পলতাডাঙায়। দেখা গেল, চন্দনার সঙ্গে এবারে ওর বেশ বনিবনাও হয়েছে—কে জানে হয়তো বা চন্দনার ডাকেতেই ও এসেছে! কি জ্বালা, এবার কি আস্তে আস্তে বেদের পাল এসে বসবাস আরম্ভ করবে নাকি পলতাডাঙ্গায় ঐ যাদুকরীর টানে? এবার আরেকরকম উৎপাত আরম্ভ হোলো। সুশ্রী সুগঠিত চেহারা আর বাঁশী বাজাবার গুণে গাঁয়ের অনেকেই মোহনের বশ হয়ে গেল, বিশেষ ক'রে মেয়েরা।

জমিদারবাড়ীর ঘাটের রাণাতে বসে নিয়মিতভাবে বাঁশী বাজাতো মোহন।

তারপর একদিন···প্রাতর্ভ্রমণ না থাকা সত্ত্বেও চিরকালের অভ্যাস-মতো রাত থাকতে উঠে সূর্য্যশঙ্কর অন্দরের বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, মানুষ-করা ঝি আন্নামা কাঁদতে কাঁদতে এলো দৌড়েঃ বাবু গো, দিদিরাণীকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঃসে কি? সূর্য্যশঙ্করকে কে যেন সপাৎ করে মারলে এক ঘা। আর্ত্তনাদ করে উঠলেন তিনিঃ দেখ, এদিকে ওদিকে কোথায় আছে।

কিন্তু আর কোথায়! বীণার চিহ্নও নেই কোথাও। ঝাড়বরদারনী সাক্ষ্য দিলে, রাতে সে বাগানে দিদিরাণীর ঘরের জানলার তলায় মোহন বেদের বাঁশী শুনেছে। সসঙ্কোচে আরো দু একজন একে একে প্রকাশ করলে—দিদিরাণী ইদানীং রোজ বিকেলে ঘাটের রাণাতে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতো। নায়েব রাধাকান্ত এলেন। প্রবীণ লোক, পাকা মাথা। বললেনঃ এখনো বেশীদূর যেতে পারা ওদের পক্ষে সম্ভব হয়নি—লোক ছুটিয়ে ধরে আনতে হবে। আমাদের লোকজন যদিও বিশ্বস্ত, তাদের কাছ হতে প্রকাশ না হলেও, সকাল হয়ে গেলে ঠিক জানাজানি হয়ে যাবেই। আর এটা গ্রাম দেশ—একবার জানাজানি হয়ে গেলে···

"হুঁ"—সূর্য্যশঙ্কর জানেন কি হবে একবার জানাজানি হয়ে গেলে।

হালকা প্রকৃতির বোকা মেয়েটার চরিত্র নিয়ে গাঁয়ের লোকেরা ফিসফাস্ করেছে এর আগে, আত্মীয়া মৃদু অনুযোগও করেছে কয়েকবার কিন্তু সূর্য্যশঙ্কর কিছুই কানে তোলেননি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। বীণু এখনো বড়োই হয়নি মনের দিক থেকে—ওর ছেলেমানুষীকে লোকে অন্যরূপে দেখে, অন্যরকম হিসাবে ধরে—এই ছিলো তাঁর বিশ্বাস। উঃ—বুঝতে পেরেছেন তিনি ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত, শয়তানী মতলব। প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁর মুখ থমথম করতে লাগলো। জলদমন্দ্র স্বরে তিনি শুধু বললেন : না! আমি যাচ্ছি, বীণাবতীকে ফিরিয়ে আনবো। না হলে আর আসবো না। কে আছিস! ঘোড়ার সাজ দে।

অনেকদিন পরে সূর্য্যশঙ্করের আদরের পক্ষীরাজ প্রভুকে পেয়ে আনন্দে লাফাতে লাগলো। কিন্তু সূর্য্যশঙ্করের তখন তা দেখবার অবস্থা নয়। লাফিয়ে রেকাবে চড়ে লাগামে কষে টান দিলেন তিনি, পক্ষীরাজ উড়ে চললো প্রায়—প্রভুর মনের কথা যেন সে বুঝতে পেরেছে।

নতুন সড়কের ধারে চন্দনা বেদেনীর ঘরের কানাচে এসে সূর্য্যশঙ্কর থামলেন—পক্ষীরাজ তখন হাঁপাচ্ছে, ঝড়ের বেগে আসার শ্রমে তার মুখ দিয়ে ফেনা পড়ছে। সূর্য্যশঙ্কর ফিরেও তাকালেন না। চন্দনা ঠিক তার নিজস্ব জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্ত্তির মতো স্তব্ধ হয়ে—কেমন করে নিজের অন্তর থেকে সে অনুভব করতে পেরেছে সূর্য্যশঙ্করের আজ তার কাছে পৌঁছবার লগ্ন এসেছে। হঠাৎ সপাং করে তার পিঠে চাবুকের ঘা এসে পড়লো অতর্কিতে, চন্দনা চমকে উঠলো। আবার—আবার চাবুক চলছে সমানে, ঘুরে লুটিয়ে পড়লো ও।

রক্তাক্ত দেহে মাটিতে ছটফট্ করতে লাগলো চন্দনা, দুচোখ দিয়ে অশ্রুস্রোত বইছে কিন্তু তবু দাঁতে দাঁত টেপা—মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজও বেরোলো না। ঘোড়া হতে খানিকটা সামনে ঝুঁকে সূর্য্যশঙ্কর

চাবুক চালাচ্ছিলেন—লাল টকটকে মুখশ্রী। দুর্দ্দমনীয় রাগ তাঁর—যে রাগে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তবুও মেয়েটার অসীম সংযমে বিস্মিত হয়েই সূর্য্যশঙ্কর চাবুক নামালেন। এতক্ষণে জ্ঞান হোল, মেয়েটাকে মেরে ফেললে খবর বার করা সম্ভব হবে না। দাঁতে দাঁত পিষে তিনি কথা বললেন এইবার: মোহনের সঙ্গে বীণাকে কোথায় পাঠিয়েছিস বল্ শিগ্‌গির। তিলতিল করে নাহলে তোকে আমি এখানেই খুন করে করে ফেলবো—বল্।

: সে কি? অকৃত্রিম বিস্ময়ে ঐ অবস্থাতেও চন্দনা মাথা তুললো তাড়াতাড়ি—: মোহন এতদূর করেছে? শয়তানী খেলছে শেষকালে?

: তার মানে? তুই কিছু জানিস না?

চন্দনা বুকে ভর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল সামনে। ঈষৎ উঁচু হয়ে হাত বাড়িয়ে সূর্য্যশঙ্করের পা জড়িয়ে ধরলো। পায়ে মাথা ঘসতে ঘসতে ভাঙা গলায় বললে,

: কসম্ খাচ্ছি বাবু—বাবু এর চেয়ে বড়ো আর কিছু তো নেই—ছুঁয়ে দিব্যি করছি মোহনের এমন দুষমনী আমি ভাবতে পারিনি।

সূর্য্যশঙ্কর বিশ্বাস করলেন। চন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাস করার উপায় ছিলো না। আনমনে মাথা নীচু করে তিনি খানিকক্ষণ কি চিন্তা করলেন, হয়তো বা মায়াও হোল একটু; অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বললেন: তোরই তো দলের লোক—তোর জানা আছে কোথায় কোথায় যেতে পারে। খোঁজ করে এনে দে আমার কাছে। পারবি না? যা চাইবি তুই এর জন্যে পাবি আমার কাছ হতে—হীরা, মণি, মুক্তা যা চাইবি···

চন্দনা এতক্ষণ তাঁর পায়ে মাথা ঘষে ঘষে শক্তি সঞ্চয় করছিলো বোধ হয়—সূর্য্যশঙ্করের শেষ কথায় ওর মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো। আবেগের আতিশয্যে ও প্রায় দাঁড়িয়ে উঠলো—: হ্যাঁ বাবু আমি, এনে

দিব। না আনতে পারলে আমি আর এ মুখ দেখাবোই না। বখ্‌শিষ দিয়ে তো খুসী করবে তুমি আমায় ?

ঃ হ্যাঁরে পাগলী। এতক্ষণে সূর্য্যশঙ্কর যেন একটু শান্ত হলেন। মন্থর গতিতে ফিরে চললেন তিনি। চন্দনা টলতে টলতে নিজের ঘরে এলে। ঝাঁপি থেকে দুতিন রকম গাছের ছাল বার করে কোনোরকমে তাই থেঁতো করে রসটা নিজের ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে। তাকে এখন কাবু হলে চলবে না—অনেক দূরের পথ যেতে হবে ; ঝুমু সর্দারের কাছে। মোহন কোথায় আছে সে ঠিকানা সর্দার নিশ্চয়ই জানে। মোহন! মোহন এরকম বেইমানী করবে কে জানতো! মোহনের সঙ্গে সেধে ভাব করে তাকে এখানে এনেছিল চন্দনাই একথা ঠিক কিন্তু সে তো বীণাকে চুরি করবার জন্যে নয়। মোহনের আলাপী এক বুড়ী ডাইনী আছে, খুব শক্তি ধরে সে। এই ডাইনীর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে অনেক রকম। মোহনের মারফৎ ওই ডাইনীর কাছ হতে বশীকরণ মন্ত্র শেখার উদ্দেশ্য ছিলো চন্দনার—পুরুষসিংহকে বশ করবার অভিসন্ধিতে আর মোহন কিনা এই শয়তানী করে বসলো !

নায়েব রাধাকান্ত ঘোড়া নিয়ে এলেন নিঃশব্দে। আহতা চন্দনা তৈরী হয়ে নিয়েছে ততক্ষণে। ভুঁইডাঙায় এসে পৌছলো ওরা - ঝুমু সর্দ্দারের বর্ত্তমান আস্তানা এখন ভুঁইডাঙায়। লোকজন আড়ালে রেখে চন্দনা গিয়ে সর্দ্দারের কাছে কেঁদে পড়লো। মোহন তার এই হাল করে পালিয়ে এসেছে—সর্দার সালিশ বিচার করুক। পলতার মাঠে সে নিজের মনে ঘর তুলে বাস করছিলো সর্দার জানে তো – তারপর এই কদিন আগে মোহন গিয়ে জেঁকে বসলো তার ঘরে—বললে কিনা সর্দার হুকুম দিয়েছে তাকে বিয়ে সাঙা করতে। সর্দারের নাম শুনে চন্দনা আর অমত করেনি কিছু। ওমা তার পেটে অন্য মতলব ছিলো চন্দনা কি করে জানবে ? কাল রাতে জমিদারের বোনকে নিয়ে পালিয়েছে—চন্দনা

বাধা দিতে গিয়েছিল, এমনি করে চাবুক চালিয়েছে চন্দনার ওপর।

ঝুমু সর্দার রেগে আগুন হয়ে উঠলো।

চন্দনার মিথ্যে কথা বলবার তো কোন কারণ নেই। চন্দনাকে ছেলেবেলা হতে সর্দার মানুষ করেছে—শান্ত স্বভাবা এই মেয়েটির প্রতি তার যথেষ্ট মমতা ছিলো। মোহন যদিও তার ডানহাত কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিৎ। মোহনকে যেখান হতে হোক খুঁজে বের করবার জন্তে সর্দার তার দলবল তৎক্ষণাৎ চারদিকে পাঠিয়ে দিলে।

মোহন এতটুকুও সতর্ক হয়নি। মা মঙ্গলচণ্ডীর আশ্রমে সে আশ্রয় নিয়েছিল—জমিদারের সাধ্য কি তাকে এখান হতে খুঁজে বার করে তার চুলের ডগা ছোঁয়! এক পারে সর্দার—তা কালই সে সর্দারের কাছে গিয়ে সব খুলে বলবে। আর এক চন্দনা। চন্দনা তো কিছু করবেই না—সূর্যশঙ্করের ওপরে চন্দনার মন পড়েছে—তাঁর বোনের ওপরে যদি মোহনের মন পড়ে তো তাতে চন্দনার কি বলার আছে। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে মোহন ঘুমিয়ে পড়েছিল—নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরে অনুশোচনায় কেঁদে কেঁদে বীণাও তখন নিদ্রিতা—সহসা মোহনের পায়ে কি কামড়ালো কুট্ করে। অস্ফুট চীৎকার করে মোহন জেগে পড়লো—অন্ধকারেও জাত বেদের লক্ষ্য ভুল হোলো না—ইঁটের চাপড়া ছুঁড়ে সাপটাকে মারলে মোহন। বেশ বড় গোছের হিলহিলে উদয় নাগ। সাপটার অন্তিম ছটফটানি দেখে অন্তরালে দাঁড়িয়ে চন্দনার দু'চোখে জল ভরে এলো। বেদের মেয়ে হয়েও সাপখোপকে চিরকাল সে ঘৃণাই করে এসেছে কেবল এই একটি সাপ তার বড়ো আদরের ছিলো। পুষেছিল এটাকে—কেমন সুন্দর দেখতে আর কি বিশ্বস্ত তার! ক'দিন এদের কোনো যত্ন সে নেয়নি—সাপটাকে কামাতেও দেয়নি অনেকদিন

বিষদাঁত গজিয়েছে তাই। সেই বিষের এই ব্যবহার করলে চন্দনা—জীবন দিয়ে সাপটা আজ তার উপকার করে গেল।

মোহন ততক্ষণে কষে বাঁধন দিয়েছে ক'টা পায়ে, কিন্তু—এতক্ষণ পরে হঠাৎ যন্ত্রনা আর ভয়ে সমস্ত শরীর তার কুঁকড়ে উঠলো—সর্বনাশ! জড়িবুটি শিকড়পাতি কিছুই তো নেই তার কাছে! তাড়াতাড়ি সেই অবস্থাতেই মোহন ছুটলো—সর্দারের কাছে যেতে হবে এক্ষুনি। নিজের প্রাণসংশয়ের সময়ে বীণার কথা আর তার মনে রইলো না।

সূর্য্যশঙ্কর অপেক্ষা করছিলেন উদ্বিগ্নভাবে। চন্দনা এলো অবশেষে। বীণাকে সঙ্গে করে পৌঁছিয়ে দিলে। আদরের বোনটিকে ফিরে পেয়ে সূর্য্যশঙ্কর খুসী হয়ে উঠলেন। চন্দনা কাছে এসে দাঁড়ালো। ঃ আমার বখ্‌শিষ বাবু। স্মিতদৃষ্টিতে সূর্য্যশঙ্কর তাকালেন ওর দিকে ঃ হ্যাঁ কি চাস বল্‌?—একটু ঝুঁকে পড়ে অস্ফুটকণ্ঠে চন্দনা তার প্রার্থনা জানালে। থরথর্‌ করে সূর্য্যশঙ্করের সারা দেহ কেঁপে উঠলো—সপাং করে বেতের বাড়ি আবার চন্দনার মুখে চোখে ছুটে এসে রক্তের ধারায় কেটে বসলো—অবরুদ্ধ ক্রোধে সূর্য্যশঙ্কর শুধু বলতে পারলেন ঃ দূর হ এক্ষুনি এখান হতে।

কিন্তু কথার নড়চড় জমিদার রায় শ্রীসূর্য্যশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের হয় না।

গল্পের আর বাকী নেই বেশী।

প্রচণ্ড মার খাওয়ার তাড়সে জ্বর, শরীরের অসহ্য জ্বালা যন্ত্রনা—চন্দনা ভুলে গেল সব। সমস্ত দিন ধরে ছোট্ট কুটিরটি মেজে ঘষে পরিচ্ছন্ন তকতকে ঝকঝকে করে তুললে, কদিনের অবহেলার পুরোপুরি শোধ নিলে যেন তার ছোট্ট গৃহস্থালী। পরিষ্কার করে রঙ করলে—বন থেকে ঝাড়ে ঝাড়ে ফুল তুলে এনে কুঞ্জ তৈরী করলে—আজ তার জীবনে সমাপ্তির শ্রেষ্ঠ উৎসব। একা হাতে করলে সব, কোন সাক্ষী থাকবে না

আজকের দিনটির। তারপর গোধূলি বেলায় পুকুর হতে গা ধুয়ে এসে নিজে সাজতে বসলো মনের মতো করে—বাসক সজ্জা তার।

গোধূলি উৎরে গেলে নিঃশব্দ সঞ্চারে পক্ষীরাজ এসে দাঁড়ালো চন্দনার ঘরের পাশে—বরবেশী সূর্য্যশঙ্কর নেমে এলেন।

সেইদিন সন্ধ্যালগ্নে গান্ধর্ব্বমতে চন্দনার ঘরের উঠোনে মাঙ্গলিক সামান্য অনুষ্ঠান শেষ করে সূর্য্যশঙ্কর চন্দনাকে বিয়ে করলেন।

বিয়ে করলেন? একটা বেদের মেয়েকে ?? সূর্য্যশঙ্কর চৌধুরী ???

হ্যাঁ, নাহলে আর তিনি সূর্য্যশঙ্কর কেন? অবদমিত ক্রোধের আবেগে তাঁর সর্ব শরীর ফেটে পড়ছিল প্রায় তবু তিনি বিয়েতে অমত করলেন না। চন্দনা তাঁকে এক রাত্রের জন্য চেয়েছিল—কিন্তু সূর্য্যশঙ্কর অনাচার সহ্য করতে পারেন না। চন্দনাকে একরাত্রের জন্যে তাই তিনি তাঁর স্ত্রীর মর্য্যাদা দিলেন, চন্দনার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। নীচ জাতীয়া নারীকে স্ত্রী হিসাবে বরণ করে জমিদার কুলগৌরবকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর কথার দাম খাঁটিত্বের গৌরব বহন করে আসছে আজ পর্য্যন্ত।

চতুর্থীর ক্ষীণতনু চাঁদ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে এই অদ্ভূত বিবাহের অনুষ্ঠান। মালা বদল শেষ করে বরকে হাতে ধরে বাসর ঘরে নিয়ে এলো চন্দনা—তিল তিল করে তার সমস্ত মানস দিয়ে গড়া, স্বপ্নকণা দিয়ে রচা, প্রাণের অর্ঘ্য উজাড় করে দেওয়া ফুলের বাসর শয্যা।

তারপর?

তারপর আর কি! সে রাতও শেষ হোলো অবশেষে একসময়ে—প্রভাত যেন এলো বড়ো তাড়াতাড়ি। ময়ূরাক্ষীর ঝুরঝুরে পলিমাটির তাল দিয়ে গড়া সেই কোমলাঙ্গীর কণ্ঠ শেষরাতে সজোরে চেপে ধরতে সূর্য্যশঙ্করের কি এতটুকুও ব্যথা লাগে নি—না দেহে, না মনের? যে নিশ্চিন্ত তাঁরি দেহলগ্না হয়েছিল সারারাত ভ'রে? কে

জানে, তৃতীয় কোনো সাক্ষী তো তখন উপস্থিত ছিলো না সেখানে। তখন না থাকলেও সাক্ষী থেকে গিয়েছিল পরের দিনের।

মানবক-একটি। বিশালাক্ষী দেবীর সেবায়েতের সব ছোটো ছেলে।

ঃ এই আমি! বুঝলে বাবা? রামতারণ চক্রবর্ত্তী এগিয়ে এসে বসলেন আসরে শ্রোতার মুখোমুখী।

খেলা করতে করতে বালক বেরিয়ে পড়েছিল। কৌতূহল ভরে সে দেখেছিলো কয়েকটি অপরিচিত লোকের কাণ্ডকারখানা। সূর্য্যশঙ্কর তখন প্রাসাদে চলে গেছেন; বিশ্বস্ত অনুচরেরা সব ব্যবস্থা শেষ করছে নিঃশব্দে গোপনতা বজায় রেখে—একটা শিশুকে তারা বিশেষ গ্রাহ্য করলো না। কিন্তু সেদিনকার সেই শিশুর মনে গভীরভাবে কেটে বসে গিয়েছিল রাত শেষের সেই অসাধারণ দৃশ্যটি। দাওয়া থেকে ক'জনে ধরাধরি করে নামালো একটি নারীমূর্ত্তি—লাল চেলী পরিহিতা, চন্দন চর্চ্চিতা, সীমন্তে জ্বলজ্বল করছে সিন্দূর রেখা, সুকুমার সুশ্রী পেলব সারা দেহখানি পুষ্পাভরণ দিয়ে সাজানো। রাতের ফুল তখন লতিয়ে পড়েছে কিন্তু সেই তরুণীর আধ বোজা চোখের তারায় তারায়, ঠোঁটের কোণে কোণে মিষ্টি মৃদু হাসিতে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির স্বাক্ষর আঁকা রয়েছে—অসহ্য শ্বাসরোধকারী কষ্ট যেন তাকে পেতে হয়নি—

দয়িতকে পাওয়ার কামনা-তৃপ্তির মহাসার্থকতায় বিভোর হয়ে সে মহানিদ্রায় মগ্না যেন তখন।

তারপর?

তারপর আর কি! কাল গড়িয়ে চললো ক্রমশঃ। বীণাবতীর বিয়ে হয়ে গেল ভালো ঘরে বরে। রঞ্জন বড়ো হয়ে উঠলো—মানুষ হোলো। সূর্য্যশঙ্কর তার পরে আরো অনেকদিন বেঁচেছিলেন।—দীর্ঘকাল। কিন্তু নিরপরাধ একটি লোকের পরমায়ু কেড়ে নেওয়ার আত্মগ্লানিতেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক সূর্য্যশঙ্কর তারপর হতে কেমন যেন হয়ে

গেলেন। সংসারে তেমন আর মন লাগলো না তাঁর—সারা বিশ্বের প্রতিই উদাসীনতা এসে গেল।

চন্দনা ঘুমিয়ে রইলো ঐ বৌমারীর ডাঙার মাটির তলায়। সূর্য্য-শঙ্করদের তরফ হতে যথেষ্ট গোপনতা আর সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কেমন করে ব্যাপারটা বছর কয়েক পরে জানাজানি হয়ে গেল ঠিক। ঐ অতবড়ো মাঠটা শুকিয়ে গেল দেখতে দেখতে—সমস্ত জীবনীশক্তি আহরণ করে নিলে যেন মাটির তলাকার বাসর-মত্তা চির নববধূ। চন্দনা আজো ঘুমিয়ে আছে ওখানে।

আজো !!

ভ্রষ্টকল্পনা

কামরায় একা জাগিয়া বসিয়া আছি।

ট্রেন্ ছুটিতেছে পূর্ণ বেগে।

যাহা এখন সমস্ত মন জুড়িয়া জাগিয়া থাকিবার কথা তাহা মনে পড়িতেছে না—মনে পড়িতেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ক তত্ত্ব।

মনে পড়িতেছে গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি :—

'দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥'

আশ্চর্য্য—মানবমনের বিভিন্নমুখী চিন্তাধারায় সামঞ্জস্য বিধান। শুধু কি তাহাই? আশ্চর্য্যতর নহে কি মানবান্তরের অজ্ঞাত চেতনার সঙ্কীর্ণ অলিগলির জটিলতা—অবচেতন তত্ত্বের অপূর্ণ বিকাশ পদ্ধতি? আশ্চর্য্য নহে, সুগভীর সজল দৃষ্টির অন্তর্বেদনাকে এড়াইবার প্রয়াসে চোখ নত করিয়া কুন্দ-শুভ্র দন্তে অধর পিষিয়া মৃদু হাসির ছলনা?

পূজারিণী! পূজা!!

চিন্তার মোড় ঘুরাইবার চেষ্টা করি। না, উহা আমার চোখের ভুল; দুরন্ত বেগে রাশ ছাড়িয়া দিয়াছিলাম আমার কল্পনাকে তাই সে নিছক মনের তৃপ্তি মিটাইবার উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছে পূজার সজল আঁখিচ্ছবি—অশ্রুভারাতুরা তরুণীর ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া মিথ্যা আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে।

মিথ্যাই বটে ! পূজা শুধুই হাসিয়াছিল !!

প্রথম যেদিন মোটা কন্‌ট্রাক্টের খাতিরে এই পুরাতন শহরটিতে পা দিয়াছিলাম সেদিন আকর্ষণীয় কোনো কিছুই ইহার বুকে খুঁজিয়া পাই নাই। স্থানীয় গার্লস্‌ স্কুলের সেক্রেটারীর সহিত নিকট আত্মীয়তা ছিল, তিনিই চারদিন স্কুল বিল্ডিংয়ে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রতিষ্ঠা দিবস, পুরস্কার বিতরণী ইত্যাদি উপলক্ষ্যে ঐ সময়টা স্কুল বন্ধ ছিলো। স্থানীয় এজেন্সীতে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া সিকিউরিটি সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিয়া, লরীর ব্যবস্থা করিয়া যখন বাসায় ফিরিলাম—সমস্ত দিনের পরিশ্রান্ত দেহ তখন রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।

সহচর রামদীন পাঁড়ে একাধারে আমার ঠাকুর, চাকর, গৃহিণী, ভাঁড়ারী, সাথী, বন্ধু সব কিছুই। নূতন স্থানে, অনভ্যস্ত পরিবেশে উহারি মধ্যে সে রাত্রির খাবার তৈয়ারী করিয়া বসিয়া ছিল। ডাল দিয়া খানকয়েক পুরী, একটা ডিম ও খানিকটা জ্যাম্‌ উদরস্থ করিয়া কোনোমতে শয্যা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘুমে দুচোখের পাতা ভারী হইয়া আসিতেছিল।

কতক্ষণ পরে ঠিক বলিতে পারি না আন্দাজ ঘণ্টাদুয়েক পরে সহসা এক গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া হ্যারিকেনের শিখা উজ্জ্বল করিয়া দিলাম। নাঃ, রামদীন পায়ের কাছে অঘোরে ঘুমাইতেছে। তবে ? শব্দটা হইয়াছে ঠিক আমার মাথার উপরে অর্থাৎ কিনা উপরের ঘরে। উপরে ঘর আছে কিনা ঠিক তাহা তো লক্ষ্য করি নাই, ছাদও হইতে পারে। বিড়ালে এত জোর শব্দ করিতেই পারে না তবে চোর নিশ্চয়ই। ফাঁকা স্কুল বাড়ীতে চোর আসিবেই বা কি করিতে ? হয়তো টের

পাইয়াছে আমি এখানে উঠিয়াছি—নবাগত তাহার উপর অপরিসীম ক্লান্ত সুতরাং সুযোগ বুঝিয়াছে। রামদীনকে ধাক্কাধাক্কি করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম তাহাতে তাহার নাসিকাগর্জ্জন আরো প্রবল হইল মাত্র। প্রভাতের পূর্ব্বে উহাকে কোনোমতেই ঘুম হইতে তুলা যায় না এই একটিমাত্র দোষ উহার। টর্চ্চটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। দ্বিতলে "অষ্টম শ্রেণী—'খ' বিভাগ" শিরোনামা যুক্ত ঘরখানি সেক্রেটারী মহাশয় আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, ইহার পাশ দিয়াই সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে। টর্চ ফেলিতে ফেলিতে সিঁড়ি বাহিয়া ত্রিতলে উঠিলাম। সিঁড়ির পাশে পর পর দুইখানি ঘর—দুখানিরই দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। স্কুলের সার্ভেণ্টস্ কোয়ার্টার এখান হইতে অনেক দূরে—মাঠ পার হইয়া তিন চারিটি খুপরীর একখানি চালা—দুইজন বেয়ারা ও একজন মালী থাকে, দুপুরে খোঁজ নিয়াছিলাম। তবে? তাহারাই কি এখানে আসিয়াছে? সম্মুখের ঘরখানিই আমার ঘরের ঠিক উপরকার ঘর, একটু ইতস্ততঃ করিয়া জোরে ধাক্কা দিলাম কয়েকটা। মিনিটখানেক পরে দরজাটা খুলিয়া গেল—একহাতে একটি বৃহৎকায় লাঠি ও অপরহাতে একটি শক্তিশালী টর্চ লইয়া একটি তরুণী মুক্ত দ্বারপথে আবির্ভূতা হইলেন। হতচকিতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গভীর রাত্রে, অচেনা অজানা পরিবেশে সমস্তটা জড়াইয়া মনে হইল যেন একটা অলৌকিক ব্যাপার কিছু ঘটিতেছে, যেন ও তরুণীটি মানবী নহে।

চমক ভাঙ্গিল তরুণীটির রূঢ় কণ্ঠস্বরে।

ঃ কে আপনি? এত রাত্রে একজন মহিলার ঘরের দরজায় ধাক্কা মারছেন? কি দরকার আপনার?

স্খলিত কণ্ঠে কহিলাম : ন্—না, কিছু মনে করবেন না, কোনো মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে আসিনি। আপনার এখানে অবস্থিতির কথাও আমার জানা ছিলো না বিশ্বাস করুন।

চুপ করিয়া গেলাম্! তরুণীটির ভ্রূভঙ্গী কথার খেই হারাইয়া দিতেছে। ওকি বিশ্বাস করিতেছে না! ভাবিতেছে অন্য মতলব কিছু আছে আমার ?

: ওপরে এলেন যে ?

: একটা খুব জোরে শব্দ হোল এঘর থেকে, কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ। ঘুম ভেঙ্গে গেল তাতে—ভাবলাম বুঝি…

: চোর কিংবা বেড়াল। তাই না ? সহসা তরুণীটি খিল খিল করিয়া সুমিষ্ট কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

: চোরও নয় বেড়ালও নয় বুঝেছেন ? এই আমি, পূজারিণী মুখোপাধ্যায় খাট থেকে পড়ে গিয়েছি ঘুমোতে ঘুমোতে। খাট মানে ছুটো বেঞ্চি জোড়া করে টেম্পোরারি খাট বানিয়ে নিয়েছিলাম—তাতে শোওয়া অভ্যাস নেই তো তাই!

হাসি দেখিয়া সাহস হইল। লাঠিটার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, : আর আমাকেও নিশ্চয়ই আপনি চোর ভেবেছিলেন ? ভ্রূলতা পুনর্ব্বার আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

: এ অঞ্চলে চোরের উপদ্রব নেই। আমি ভেবেছিলাম, অমর সিং বেয়ারা কোনো দরকারে ডাকছে বুঝি। আপনার থাকা সম্বন্ধীয় একটা কি কথা সেক্রেটারী মশায় বলছিলেন আজ বিকেলে, কান দিইনি তেমন। এখন মনে পড়ছে বটে।

সহসা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

অগত্যাই নামিয়া আসিলাম। কে এই তরুণী ? এই নির্জ্জন স্কুলবাড়ীতে একা কেন বাস করিতেছে ? আগাগোড়া ব্যাপারটা স্বপ্ন

নহে তো ? ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম ভাঙ্গিল একেবারে সেই সকালে ডাকাডাকির চোটে। আমার ঘরের খোলা দরজার সামনে চৌকাঠের' পরে দাঁড়াইয়া পূজা ক্রমাগত কড়া নাড়িয়া চলিয়াছে। কি অবিশ্বাস্য ঘটনাসমূহকাল রাত হইতে ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে! অপলক নেত্রে তাকাইয়া রহিলাম। সুঠাম সুন্দর দেহ, সুগৌর অঙ্গে ঈষৎ লালিমা মাখানো; দীর্ঘায়ত ঘনপক্ষ্মবিশিষ্ট দুই চক্ষে ভাসা ভাসা চাহনী, টানা টানা ভ্রূ। সুকৃষ্ণ, কুঞ্চিত কেশের রাশ সারা পিঠ ভরিয়া সর্পীর ন্যায় এলাইয়া রহিয়াছে। আমার বিহ্বল দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া পূজা ভ্রূভঙ্গী করিল।

ঃ তখন থেকে ডাকছি শুনতে পাচ্ছেন না? আপনার চাকর বাজারে গেছে। আপনার নামে ইন্‌সিওর্ড লেটার এসেছে, পিওন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে একবার রেজিষ্ট্রি বা ইন্‌সিওর্ড লেটার্ ফিরে গেলে আর তার নাগাল পাওয়া শক্ত। তাছাড়া আমাকে তো উইট্‌নেস্ হতে হবে।

কি মনে করিয়া সহসা বিমল হাস্যে তাহার সুন্দর মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

ঃ কাল রাতে আপনি আমার দরজায় যেমন ধাক্কা দিচ্ছিলেন আজ সকালে আমি এসে আপনার কড়া নাড়ছি—শোধ বোধ হয়ে গেল ঠিক।

পরিচয় হইল ক্রমে ক্রমে। পরিচয় হইল ঠিক বলা চলেনা, আলাপ হইল; এবং সে আলাপটা করিলাম আমি। বিকালের দিকে গয়লার নিকট হইতে দুধ লইবার জন্য পূজা নামিয়া আসিয়াছে—সাহসে ভর করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

ঃ ইয়ে, শুনছেন ?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পূজা আমার মুখের দিকে তাকাইল।

ঃ মানে, বলছিলুম্ কি, মানে···একই বাড়ীতে যখন রয়েছি

একটু আলাপ পরিচয় আর কি···। আচ্ছা, দুধ তো আমারও দরকার, একটু দুধের ব্যবস্থা করে দিন না!

: ব্যবস্থা আর কি করতে হবে! দুধওয়ালা তো আসেই ওর কান হতে প্রয়োজন মতো নিয়ে নিলেই পারেন।

আশঙ্কা করিয়াছিলাম, প্রশ্নের উত্তর দিয়াই সরাসরি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া যাইবে আমার নাকের উপর দিয়া। কিন্তু তাহা করিল না বরং ভালো করিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল।

ভরসা হইল।

: আচ্ছা, এ বাড়ীতে তো আপনি একা থাকেন, মনে হচ্ছে। কেন? পূজার ভ্রূ দুইটি তৎক্ষণাৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি এই উহার একটি মুদ্রাদোষ। যখন তখন, সময় নাই অসময় নাই ভ্রূলতা আকুঞ্চিত হইয়া উঠে। মিনিট খানেক স্তব্ধ থাকিয়া বোধ করি সে মনে মনে আমার প্রশ্ন ও অন্যথা কৌতূহল সঙ্গত কিনা বিচার করিল, তাহার পর উত্তর দিল।

: এই রাস্তাটার মোড়টা পেরিয়ে টিচার্স কোয়ার্টার্স। আমার জন্যে ছোট কোয়ার্টার্স একটা দিয়েছে স্কুল হতে—এই স্কুলের টিচার্ তো আমি কিন্তু সেটা ছুটিতে মেরামত করে দেওয়া হচ্ছে—কটা দিনের জন্যে তাই স্কুলবাড়ীতে আছি। আমার ঝি থাকে সঙ্গে।—কিন্তু দুধওলা তো চলে গেল, এই যে বল্লেন আপনার দুধের দরকার?

আমতা আমতা করি,

: না মানে, রামদীনই তো যা করবার করে—আমি ঠিক জানি না কতটা নিতে হবে। আজ সকালে ও আমাকে বলছিল দুধের কথা। এখানকার কাকে আর আমি চিনি তাই আপনাকেই বললাম।

: আমাকে বুঝি যথেষ্ট চেনেন?

: সে গর্ব্ব দেবতারাও করতে পারেন না আমি তো কোন্

ছার ! তবে আপনাকে প্রথমদিনেই যা চিনেছি সে মূর্ত্তিই যদি আসল রূপ হয় তবে তো খুব আশাপ্রদ নয়। আচ্ছা, ওরকম করে মাঝ-রাত্তিরে আমি দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলাম আপনি ঠিক কি মনে করলেন, বলুন তো ?

ঃ কি মনে করা সম্ভব ? চোর যদিও হয়, চোর নিশ্চয়ই দুমদুম করে দরজা ধাক্কা দিয়ে বলবে না, 'চুরি করতে এসেছি দরজাটা খুলে দাও।' এই যে, সিপ্রা ফুল এনেছো ? দাও।

একটি ছোটো মেয়ে, বোধ হয় ছাত্রী কোনো, অনেকগুলি বেল ও রজনীগন্ধা লইয়া ঢুকিল—শুভ্র ফুলের রাশ অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিয়া কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পূজা উপরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

হতাশ হইয়া গেলাম একেবারে। ওঃ, এইজন্য পূজা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল এখানে। মেয়েটার আর খানিকটা পরে আসিতে কি হইয়াছিল ! ইস্, কেমন জমিয়া উঠিতেছিল ! অগত্যাই মেয়েটির দিকে মনোনিবেশ করিলাম। ইতিপূর্বে ও আমাকে দেখে নাই—নবাগতের প্রতি অবাক দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল।

ঃ তোমার নাম কি ?

ঃ সিপ্রা বাগচী। আচ্ছা, আপনিই কালকে এসেছেন না ?

ঃ হ্যাঁ, কেন বলো তো ?

ঃ পরশুদিন দিদিমনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দিদিমনির ঝি মঙ্গলাকে দিয়ে ঘর পরিষ্কার করালেন, বললেন, "এক ভদ্রলোক আসবেন, তাঁর অসুবিধা হবে কিনা তাই।" আমিও কত সাহায্য করলুম ! আপনি দিদিমনির কে হন ?

বিস্মিত হইয়া শুনিতেছিলাম। কি আশ্চর্য্য, পূজা আমার ঘর পরিষ্কার করাইয়াছে ! কিন্তু সিপ্রার শেষের প্রশ্নে চমকিত হইয়া উঠিলাম।

সত্যই তো ছেলেমানুষ, আমাদের পারস্পরিক আত্মীয়তা সম্পর্কে উহার কৌতূহল স্বাভাবিক। কি উত্তর দিব ভাবিতেছি এমন সময়ে পূজার দাসী মঙ্গলা আসিয়া আমাদের আলাপরত অবস্থায় দেখিয়া গেল এবং পরক্ষণেই উপর হইতে সিপ্রার ডাক পড়িল। সিপ্রা চলিয়া গেল। দূর ছাই বলিয়া আমিও বাহির হইয়া পড়িলাম। হাতে জরুরী কোনো কাজ নাই আজ বিকালে - খানিকটা বেড়াইয়াই আসা যাক্। চূর্ণী নদীর তীরে তীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া বেড়াইলাম্। ছোট্ট নদীটির বেশ সুশ্রী চেহারা। খোলা হাওয়াতে মনে অনেকখানি প্রশান্তি ফিরিয়া আসিল তথাপি কোথায় যেন একটা অস্বস্তি খচ্ খচ্ করিতে লাগিল—বয়স্থা, সুন্দরী, শিক্ষিতা কুমারী কেন এরূপভাবে মফঃস্বলের বনবাসে পড়িয়া আছে? আচার ব্যবহার দেখিলে তো যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বলিয়া অনুমান হয়। তবে? এই এক অখ্যাত, নগণ্য টিচার্স কোয়াটার্সের ঘর ব্যতীত সারা পৃথিবীতে অপর কাহারও ঘরে উহার স্থান হইল না? কেন? আচ্ছা, স্বল্পপরিচিতা সম্পর্কে আমার নিজের এত মাথাব্যথাই বা কেন? ইহাই কি খুব শোভন নাকি? যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা করিবে—আমার মনে কেন সমস্যা পাক খাইয়া খাইয়া কুণ্ডলী মারিয়া মরে? তথাপি হইল না। দ্বিধা পীড়িত চিত্তে স্কুলবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

রামদীন অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি রাত্রের খাবার আনিয়া দিল। সঙ্গে এক কাপ উষ্ণ দুধ। আমার প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই উত্তর দিল: উপরের দিদিমণিকে আপনি নাকি দুধ নেবার কথা বলে গিয়েছিলেন তাই পাঠিয়ে দিয়েছেন। একেবারে জাল দিয়েই দিয়েছেন—আমার সুবিধা হোল। দ্বিরুক্তি না করিয়া সমস্তটা দুধ খাইয়া ফেলিলাম। দুধ লইবার কথা বলিয়াছিলাম নাকি?

পরদিন সকালে পাকড়াও করিলাম। পূজা বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নামিয়া আসিয়াছিল। ভিজা স্নাত চুলগুলিকে হাতে জড়াইয়া কোনোমতে একটা কবরী রচনা করিয়াছে, শাদা শাড়ী পরণে, হাই হিল্ বুটের তীক্ষ্ণ ধ্বনি কানে আঘাত করিবার মতো।

: দেখুন, একটা কথা বলছিলাম!

: বলুন।

চাহিয়া দেখিলাম, না ভ্রূযুগল এখনো কুঞ্চিত হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই।

: আচ্ছা, ইয়ে-ছি ছি, আমি বড়ো লজ্জা পেয়েছি কালকের দুধের ব্যাপারে। আপনি যে কেন আবাব কষ্ট করে—

: দামটা দিয়ে দেবেন। এক পোয়া দুধ—টাকায় দেড় সের করে দুধ এখানে—গয়লার কাছ থেকে ভেরিফাই করে নেবেন। তাহলে একপোয়া দুধের দাম পড়ে দুআনা দুপয়সা দুপাই।

নীরস স্বরে কথাগুলি বলিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া পূজা বাহির হইয়া গেল। অপ্রতিভের একশেষ হইয়া গেলাম। কি কথায় কি হইয়া যায়, কে জানে। অনাত্মীয়া নারীর সাক্ষাৎ যে জীবনে এই প্রথম তাহা তো নহে—বহু মহিলার সহিত ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট সপ্রতিভতার সহিত আলাপ করিয়াছি, আমার বান্ধবীর সংখ্যাও নেহাৎ নগণ্য নহে। কিন্তু এমন থতমত খাইতে হয় নাই তো কাহারও সম্মুখে? আশ্চর্য্য, নিজের উপরে নিজেরই রাগ ধরিতেছিল; একটা কথা অবধি আজ পর্য্যন্ত গুছাইয়া বলিতে পারিলাম না? মনের নিকট কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে মিলিয়া গেল। এতদিন যাহাদের দেখিয়া আসিয়াছি, চিনিয়াছি, জানিয়াছি, পরিচয় করিয়াছি তাহাদের সহিত এই মেয়েটির কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। আত্মপ্রত্যয়ের সুদৃঢ় বর্ম্মে আচ্ছাদিত এ মেয়ে—ব্যক্তিত্বের শিখা যেন উহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন

করিয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া জ্বলিতেছে, সে বেড়া ডিঙাইয়া উহার অন্তর্বাসিনীকে স্পর্শ করে কাহার সাধ্য ?

সারাটা দিন আর দেখা হইল না।

জরুরী কাজ এমন কয়েকটা হঠাৎ আসিয়া পড়িল চোখে মুখে দেখিবার অবসর দিল না। স্নানাহার হইল না, কিছু না! সকালবেলাই বাহির হইয়া যাইতে হইয়াছিল—সমস্ত দিনটা ভূতের মতো খাটিয়া সন্ধ্যার সময়ে যখন বাসাতে ফিরিলাম তখন মনে হইতেছিল শরীরটা আর কখনো খাড়া হইতে পারিবে না, হাড় পাঁজরা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া কাঠামোটি এইবার খসিয়া পড়িল বলিয়া। কিন্তু এত ভালো লাগিল যখন দেখিলাম দ্বিতলের বারান্দাতে চেয়ার পাতিয়া পূজা চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ঘরে ঢোকা আর হইল না।—আগাইয়া গেলাম একটু।

: আজ সকালে আপনার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম; দেখুন তো কেমন ভালো গেল সারা দিনটা আমার পক্ষে—নাওয়া নেই, খাওয়া নেই টোটো করে রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘোরা—ওঃ শরীর একেবারে ভেঙে পড়তে চাইছে।

পূজা মুখ তুলিয়া তাকাইল।

: একটু ঘোরাঘুরিই ধরছেন খালি আর তার জন্যে যে অর্থপ্রাপ্তি হোল তার পরিমাণটা বাদ পড়ছে কেন? তাছাড়া আজ ঠিক আমার মুখ দেখে তো ওঠেননি যে দায়িত্ব আমার 'পরে অর্শাবে। প্রথমদিন, যেদিন আমি ঘুম ভাঙিয়ে তুলে দিয়েছিলাম সেদিন বটে আমার মুখ দেখে উঠেছিলেন।

: তা, সেদিনই বা আমার এমন বিশেষ কি লাভ হয়েছিল ?

: আমার মতো দুর্ভাগিনীর মুখ দেখে সকালে উঠলে যথেষ্ট লাভের

সম্ভাবনা আছে বা থাকবে এমন আশ্বাস আপনাকে তো আমি দিইনি কখনো !

পূজার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

ব্যস্ত হইয়া উঠি,

: কি মুস্কিল—এমনি একটু ঠাট্টা করছিলাম এত সিরিয়াস্‌লি নিচ্ছেন কেন ?

: যাক্‌গে। পূজা সোজা হইয়া বসিল।

: সারাদিন সত্যিই নাওয়া নেই খাওয়া নেই এত কি কাজ করছিলেন ? রামদীন বেচারা ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে গেল যে। পৃথিবীতে খালি টাকাই চিনেছেন, টাকার জন্যে সব কিছুই করতে পারেন দেখছি। নিজের শরীরকে এত অবহেলা এত অনাদর, অযত্ন যে করছেন ওটাকে তো খাড়া রাখতে হবে নাহলে টাকা রোজগার করবে কে ?

হাসিয়া ফেলিলাম্।

: স্নান করতে যান। রামদীন খাবার ঠিক করছে। সুবোধ ছেলেটির মতো মহিমাময়ী রাজ্ঞীর আদেশ পালন করিতে চলিলাম।

স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। অত পরিশ্রান্ত দেহ কিন্তু ঘুম সহজে আসিতে চাহিল না। কত জল্পনা কল্পনা, মনে মনে কত তোলাপাড়া চলিতে লাগিল—নিজের মনে আজ আর অস্বীকার করিতে পারি না যে পূজাকে আমার চাই-ই ; এই একটি মাত্র কথা কিন্তু উহার প্রতিক্রিয়া কতটা বেশী—সারা চেতনা ভরিয়া কত আয়োজন, কত ভাঙা-গড়ার অভিব্যক্তি ! এমনই কি অযোগ্য হইব আমি ? প্রচুর পরিশ্রম করিয়া আমি যাহা উপায় করিয়া থাকি তাহার পরিমাণ প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট বলা চলে নিঃসন্দেহে। কলিকাতায় পৈত্রিক ভদ্রাসন আছে ; আমাদের বংশ গৌরব অক্ষুণ্ণ এখনো, এম-এ পরীক্ষার এক সময়ে

ভালো স্থান অধিকার করিয়াছিলাম, লোকে আমার চেহারা ভালো বলিয়াই থাকে। হয়তো দুর্দ্দান্ত রকমের রূপ বা গুণ তেমন নাই কিন্তু মোটামুটি কি পাত্র হিসাবে একেবারেই অচল হইব ? পূজাকে লাভ করা অসম্ভব হইবে আমার পক্ষে, উপযুক্ততার মাপকাঠি বিচারে ?

কদিন আলাপ হইয়াছে পূজার সঙ্গে ? তিনদিন না তিনযুগ ? এত অল্প পরিচয়ে এত নিবিড় অনুভূতি তো জন্মায় না, জন্মান্তরের সম্বন্ধ বোধ আকস্মিক সংযোগের আঘাতে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে নিঃসন্দেহে—পূজার মনেও কি অনুকূল তরঙ্গ জাগে নাই। এক তরফাই আমি জাল বুনিয়া চলিতেছি ? পূজার জন্য আমি এত আকুল, পূজার মনে কি এতটুকু ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয় নাই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ? কে জানে ! দীর্ঘশ্বাস পড়িল একটা। নারীর মন অস্বচ্ছতার সর্ব্বোত্তম শিখরেই চড়িয়া থাকে বোধ হয় সর্ব্বদা।

সকাল হইতেই ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। গত কাল কাজগুলার সব শেষ হয় নাই, একটু আধটু খিঁচ রহিয়া গিয়াছে, ইন্‌ভেস্ট্‌মেন্ট্ পুরা বাকী এখনো—সকালেই বাহির হইবার জরুরী তাগাদা ছিলো, আকাশের অবস্থা দেখিয়া মন অপ্রসন্ন হইয়া গেল। প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া, ঢাকা বারান্দায় বই হাতে করিয়া বসিলাম। মন পড়িয়া রহিল সিঁড়ির প্রতি। একবার নামিয়া আসে না ! বৃষ্টি-ঝরা দিনে ঢাকা বারান্দাতে পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়া অর্থহীন আলাপে সময় অতিবাহিত করিতে পারাটা যে কত কাঙ্খিত, কতটা প্রীতিদায়ক তাহা এই মুহূর্তে যেন সমগ্র অন্তর ব্যাপিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলাম। কিন্তু পূজা আসিল না। বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িলাম। দুটি মনের তন্ত্রীতে কেন সব সময়ে একই সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে না, স্বর সপ্তকে যখন একটি বাঁধা অপরটি কেন তখন বেসুরা গাহিতেই থাকে, কেন এই বৈপরীত্য ? বৃষ্টি যখন ধরিলই না বাহির হইয়া পড়ি। ঘরে ঢুকিয়া জামাজুতা পরিয়া

তৈরী হইয়া লইলাম মিনিট দশেকের মধ্যেই। নীচে নামিতেছি, প্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর কানে আসিয়া বাজিল ঃ—শুনছেন ?

উপরের দিকে চাহিলাম।

জানালার গরাদে ধরিয়া পূজা দাঁড়াইয়া আছে। এদিকে একটা জানলা আছে লক্ষ্য করি নাই তো ইতিপূর্ব্বে ? ক্ষণেকের জন্য গভীর দৃষ্টিতে তাকাইলাম—আমার দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না কিন্তু পূজা মুখ লাল করিয়া চোখ নত করিয়া ফেলিল।

ঃ বলছেন কিছু ?

ঃ হ্যাঁ। বলছিলাম্ যে এই বৃষ্টিতেও টাকা রোজগারের চিন্তায় বেরুচ্ছেন তো ? নতুন বর্ষার জলে ভিজে অসুখে পড়লে আপনার ঐ নীলমণি রামদীন করবে কি ? বর্ষাতি কোথায় ?

ঃ কোলকাতায়। বৃষ্টি পড়বে জানবো কি করে, বাঃ ?

ঃ তা জানি। এই নিন্ এটা।

জানালা গলাইয়া একটা রেন্‌কোট্ ফেলিয়া দিল। রেন্‌কোট্ লইয়াই দাঁড়াইয়া ছিল তাহলে। লুফিয়া লইয়া ধন্যবাদ জানাইবার মানসে পুনর্বার জানালার পানে তাকাইলাম। কিন্তু নাঃ, নাই। চকিতে সরিয়া গিয়াছে কখন।

ফিরিলাম যখন, দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি থামিয়াছে কিছুক্ষণ, সদ্য বর্ষণস্নাত প্রকৃতি আর মেঘমুক্ত আকাশের নীলিমা মনকে স্নিগ্ধতা-রসে ডুবাইয়া দিল যেন। এত তাজা লাগিতেছে শরীর, নীরস ব্যবসায়ীর কাঠ প্রাণও কাব্যময় হইয়া উঠিল ছোঁয়াচ লাগিয়া।

সব কাজগুলা হইয়া গিয়াছে ; স্ফূর্ত্তি ভরে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছিলাম। সিঁড়ির বাঁকের মুখে খানিকটা ঘেরা জায়গা সেখান হইতে কাহাদের কথাবার্ত্তার সুর ভাসিয়া আসিল। কৌতূহল ভরে গান থামাইয়া উঁকি মারিলাম। সিঁড়ির ওদিকে

মুখ করিয়া এদিকে পিছন ফিরিয়া দুটি ছোটো মেয়ে পুতুল সাজাইতে ব্যস্ত। এই স্কুলেই পড়ে এবং এই রাস্তাতেই থাকে আগেও দেখিয়াছি। ছুটির দিনের দুপুরে ফাঁকা স্কুলবাড়ীর প্রতি বোধ হয় লোভ জাগিয়াছে পুতুল খেলিবার জন্য। বড়োদের বকুনী তো কিছু নাই এখানে।

গল্ গল্ করিয়া গল্প চলিতেছে সমানে।

: নতুন বাবুকে দেখেছিস্?

: হ্যাঁরে, সেদিন আমাকে একটা চকোলেট দিয়েছিল ডেকে।

: সিপ্রার সঙ্গে একদিন নাকি অনেক গল্প করেছে। সিপ্রা বলছিল, বেশ লোক।

: বেশ হলেই ভাল। ওর সঙ্গেই তো দিদিমণির বিয়ে হবে।

: কে বললে তোকে ?

: দিদি বলেছে। দিদি একদিন ছাত থেকে দেখেছে যে নতুনবাবু আর দিদিমণি বিয়ের বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছিল।

: তাই বুঝি ও এখানে এসেছে রে ?

: হ্যাঁরে, এই ছুটিতে দিদিমণিও এই স্কুলবাড়ীতে এসে রইলেন আর নতুন বাবুও এলো। এর আগে তো কখনো আসেনি !

: কবে বিয়ে হবে রে ?

আর শুনিতে ইচ্ছা হইল না। সমস্ত স্ফুর্ত্তিটুকু উবিয়া গিয়া তিক্ততায় মন ভরিয়া উঠিয়াছে, ইচ্ছা করিতেছিল অকালপক্ক মেয়ে দুইটাকে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় কষাইয়া দিই বেশ করিয়া। প্রাণপণে ইচ্ছাটাকে দমন করিয়া সরিয়া আসিলাম। সিঁড়ির বাঁক ঘুরিয়াই দেখি সম্মুখে পূজা। বাহির হইবার জন্য নামিতেছিল, আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সারিয়াছে ! শুনিতে পায় নাই তো ? ক্ষণপূর্ব্বের তিক্ততার পরিবর্ত্তে ভয় পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল—উহাদের আলাপের কণামাত্রও পূজার

কানে পৌছিলে তো সর্ব্বনাশ। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া রেন্-কোট্‌টি বাড়াইয়া ধরিলাম।

: এই নিন্। বাব্-বাঃ, এ সব সৌখীন সুন্দর জিনিষ হ্যাণ্ডল্ করা কি আমাদের মতো কাঠখোট্টা লোকেদের মানায় না পোষায়? কি ভাগ্যি তবু যে ওয়াটার প্রুফ্ দিয়েছেন, একটা প্যারাসোল্ দিলেই গিয়েছিলাম আর কি! কারুকার্য্যময় লেডিস্ বেঁটে চমৎকার অকেজো ছাতা একটি!

: বেশ। আমার ওয়াটার-প্রুফ্ আমার ছাতা যেমনই হোক্ না। এত বেলা করে ফিরলেন আর রামদীন্ বেচারা······

হাসি পাইল। রামদীনের আড়াল দিয়া আর কতদিন চালাইবে তুমি? শুধুই কি আজ রামদীন একা উদ্বিগ্ন হয় আমার জন্য? মুখে বলিলাম,

: তাই বুঝি, খুঁজতে বেরোচ্ছেন?

: বাঃ, খুঁজতে গেলাম কিসের জন্য? আমার কাজ আছে।

: এই বাদলা দিনেতে?

: হ্যাঁ, বাদলা দিনেতে আমারও কাজ থাকতে পারে।

: আমি কোথায় ভাবছিলাম ভিজে ফিরছি, বাড়ী গিয়ে শ্রীহস্তের তৈরী চা খাবো এক কাপ গরম গরম ফরমাস করে।

: রামদীনকে বললেই ও করে দেবে। শ্রীহস্ত যে কোনো শ্রীউদরকে চায়ের দ্বারা পরিতৃপ্ত করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে বাড়ীতে বসে, এ খবরই বা কোথায় পেলেন? আর তাছাড়া, এত বেলাতে আর চা খেতে হবে না।

সহসা সব আলোচনাতে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়া দ্রুতবেগে নামিয়া গেল। তা যাউক গে, মন আমার লঘু হইয়া গিয়াছে। পূজার মুখ প্রশান্ত—নিশ্চয়ই কিছু উহার কানে যায় নাই।

আহারান্তে লম্বা টানা ঘুম দিয়া উঠিয়া বাহিরে গিয়া বসিলাম। সবে মাত্র গোধূলি নামিয়াছে,—কবির ভাষায় দূর দিগন্তে শব্দহীন ভাস্বর সমারোহের সহিত দীপ্ত সূর্য্যাস্তের আয়োজন চলিতেছে।

—মুগ্ধ নেত্রে তাকাইয়া রহিলাম।

কতক্ষণ পরে পিছনে পদশব্দ শ্রুত হইল।

চকিতে মুখ ফিরাইলাম। পূজা ফিরিতেছে এতক্ষণ পরে।

শ্রান্ত পদক্ষেপে শ্রম জর্জ্জর দেহ টানিয়া টানিয়া উঠিতেছিল—কালো হইয়া গিয়াছে মুখশ্রী, কপালের 'পরে জমিয়া থাকা স্বেদকণাগুলি চক্ চক্ করিতেছে। নিকটস্থ হইয়া হাসিল একটু,

: আপনি তো বেশ ফ্রেশ্ হয়ে গেছেন দেখছি আমার এবারে ক্লান্তির পালা।

: কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ক্লান্ত হবার জন্যে ?

: কাজ ছিল।

আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, বিকাশবাবু।

একটা চেয়ার আগাইয়া দিলাম।

: নিন্ বসুন্। বসে বসে বলুন। যা হাঁপাচ্ছেন !

: না, ঠিক আছে। চেয়ারে ঠেস দিয়া পূজা দাঁড়াইয়াই রহিল।

: কথাটা হচ্ছে—আমি হয়তো আপনাকে ঠিকমতো গুছিয়ে বলতে পারবো না তার জন্যে কিছু মনে করবেন না। এরকমভাবে একবাড়ীতে আমাদের থাকাটা ভালো দেখায় না একেবারে। আমার ছাত্রীদের মধ্যেও এ নিয়ে আলোচনা চলছে—এর আগে কানাঘুসো কানে এসেছে আমার, কিন্তু আজ দুপুরে একেবারে স্পষ্ট শুনেছি। আপনার কানে যাতে না পৌঁছায় তখন সেই কথাই মনে হচ্ছিল কিন্তু এখন ভেবে ঠিক করলাম আপনাকে জানানোই উচিত। বড়োরা তো বটেই, ছোটোরা অবধি বাদ যাচ্ছে না। আমি ওদের শিক্ষয়িত্রী—আমার

চরিত্রকে সমালোচনার বস্তু করে তোলবার মতো সুযোগ যাতে ওরা না পায় সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিৎ অন্ততঃ আমার পক্ষে। নিজেকে ওদের সামনে আদর্শ খাড়া করাই আমার কাম্য। আপনি অতিথি তায় নবাগত, এক্ষেত্রে আমারই চলে যাওয়া উচিত ছিলো কিন্তু আজ সারাদিন ওদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে দেখলুম্ খুব তাড়া দিলেও মিস্ত্রীগুলো আরো তিনদিন নেবে আমার কোয়াটার্স সারাতে। আমারো আত্মীয় পরিজন এমন এখানে কেউ নেই যাঁর কাছে যেতে পারি ঐ তিন-দিনের জন্যে। হোটেলে আমার পক্ষে ওঠা সম্ভব নয় কিন্তু আপনার পক্ষে···আমায় মাপ করবেন—

কয়েক মিনিট কোনো কথা কহিতে পারিলাম না। আঘাতের আকস্মিকতা একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

ঃ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। হোটেলের আর প্রয়োজন হবে না, আমি কালকেই চলে যাব এখান হতে।

ঃ কালকেই ?? কিন্তু আপনার তো সব কাজ সারা হয়নি এখনো, আরো দিন চারেক লাগবে—রামদীন বলছিল! আমার জন্যে যদি আপনার ক্ষতি হয়—

ঃ যা কাজ হয়েছে সেই যথেষ্ট, তাছাড়া এও তো একটা মস্ত কাজ! ক্ষতির কথা বলছিলেন মিস্ মুখার্জ্জি ? অনেক বড়ো ক্ষতি সইতে হচ্ছে না কি আমাকে ? আমার দ্বারা এতটুকু ক্ষতি হতে পারে এ তুমি বিশ্বাস করো, পূজা ? কোনো অসম্মান করতে পারি আমি তোমাকে ?

নতমুখী নীরবে মাথা নাড়িল শুধু।

ঃ ওদের কথা আজ দুপুরে আমারো কানে এসেছে। আমিও তখন ভয় করছিলাম তুমি না শুনতে পাও।

পূজা চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

: ওরা···ওরা যা বলছিলো তা কি হতে পারে না কিছুতে? কোনো বাধা তো নেই আমাদের দুতরফে! তাহলে এসব কথাসৃষ্টি, কানাঘুসোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

: সম্ভব নয় কোনোমতেই! আরক্তমুখে এই একটি কথামাত্র বলিয়াই সহসা পূজা প্রস্থান করিল। কারণ জানাইয়া গেল না কেন? আত্মবিস্মৃতের মতো বসিয়া রহিলাম স্থাণুবৎ।

সকালেই ট্রেন। উদাসনেত্রে বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিলাম। বিশ্বপ্রকৃতিই কেমন যেন ব্যর্থ মনে হইতেছে, নিরর্থক ঠেকিতেছে সব কিছু। কোথাও অবলম্বন পাইতেছি না—কল্পনাতে যে প্রাসাদ গড়িয়াছিলাম তাহার সমাধি হইয়া গেছে—অবুঝ মন শুধু হাহাকার করিয়া ফেরে। সংসারে আমার কেহই নাই, সব ফাঁকা—এতটুকু স্নেহ, ভালোবাসার তৃষা তাই এত বেশী।

পূজা ভোরবেলা হইতেই নামিয়া আসিয়াছে। ব্যস্ততার সহিত রামদীনের সঙ্গে মিলিয়া জিনিসপত্র গুছাইতেছে। এককাঁকে পরিপাটি করিয়া স্বহস্তে চা ও খাবার প্রস্তুত করিয়া গুছাইয়া দিয়া গেল।

: চায়ের কথা বলছিলেন না?

আজ নাই, বলিয়াছিলাম কাল। আজ দিয়া গেল তাই ক্ষতিপূরণ হিসাবে? কোমরে কাপড় জড়াইয়া উত্তেজনার সহিত ঘরময় ঘুরিয়া কাজ করিতেছে। সর্পীর ন্যায় চুলগুলি এলাইয়া পড়িয়াছে—সুন্দর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে; তাকাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কি হইবে আর মিছামিছি দেখিয়া! কিছুই আমার আর ভালো লাগিতেছে না, কিছু ইচ্ছা করিতেছে না।

: দেখুন, টিফিন্ ক্যারিয়ারে কষ্ট করে খাবার তৈরী করে ভরে দিলাম। এক টুকরোও ফেলতে পাবেন না কিন্তু। কোথায় দেব এটা, বলুন তো? হোল্ড্-অলে? না, হোল্ড্-অল্ যদি ট্রেনে না খোলেন

বাস্কেটে দিই এটা। রামদীন্, দেখো তো বাবু যেন খান—আমি পরে তোমার কাছ হতে খোঁজ নেবো।

ঃ আপনার কষ্ট করে খাবার তৈরী করবার কোনো দরকার ছিলো না। আমি কেল্‌নারে খেয়ে নিতাম্। সেইটাই আমার চিরকালের অভ্যাস—অত যত্ন এখন সইলে হয়।

নীরস স্বরে কথাগুলি বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সময় হইয়া গেছে। রামদীনও অত্যন্ত বিষণ্ণ। দিদিমণিকে উহার বড়োই ভালো লাগিয়াছিল। বেশ বুঝিতে পারিতাম, কি যেন প্রস্তাব একটা উহার মনে উঁকি ঝুঁকি মারিত কিন্তু আমার ভয়ে প্রকাশ করিতে পারে নাই।

ঃ গিয়ে চিঠি দেবেন কিন্তু একটা - পৌছোনো খবরটা যেন অন্ততঃ পাই। এখানে যে একটা লোক রইলো. যে কিছু ভাবতে পারে এ তো আপনি ট্রেনে পা দিলেই ভুলে যাবেন।

স্টকেশ্ ও বিছানা লইয়া রামদীন বাহির হইয়া গেল।

ঃ একটু দাঁড়ান তো!

সহসা নত হইয়া পূজা আমার পায়ে মাথা রাখিল।

ঃ ভেবে দেখলাম, বয়সে বিদ্যায় কৌলীন্যে সবেতেই যখন আপনি বড়ো তখন নমস্কার না করে প্রণাম করাটাই ভদ্রতা। আপনারও প্রাপ্য ওটা।

গলার মধ্যে কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিতেছিল। প্রাণপণে সেটা দমন করিয়া ভালো করিয়া উহার মুখের দিকে একটিবার তাকাইলাম। চোখ দুইটি সজল দীর্ঘায়ত দুই.চোখের কূলে কূলে জল টল্ টল্ করিতেছে কিন্তু ঠোঁট দুইটি হাসিতেছে। নিঃশ্বাস চাপিতে চাপিতে বাহির হইয়া আসিলাম। যে কদিন স্কুল খুলিতে বাকী আছে সে কদিনও কি এত বড়ো নির্জ্জন বাড়ীতে আমার কথা একবারও মনে পড়িবে না ওর? চারদিন তো আমি সঙ্গী ছিলাম—একটা বিড়াল কুকুরও চলিয়া গেলে

মানুষ তাহার অভাব বোধ করে। আমার ঘরটির শূন্যতা কি একটিবারও স্মরণ করাইয়া দিবে না যে একদিন আমি ছিলাম সেখানে—ক্ষণিকের অতিথি?

কামরার বেঞ্চের 'পরে সন্তর্পণে পা দুইটি তুলিয়া দিয়াছি। সমস্ত দেহের মধ্যে এখন উহারাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পত্তি···

একটি অমূল্য প্রণামের শুচিতা উহাদের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতেছে···এখনো সে প্রণাম বাসি হইয়া যায় নাই।

অগ্নিশুদ্ধি

সদর দরজাটা বন্ধ করা রয়েছে।

দোতলার বারান্দা থেকে বিমলা দেবী মুখ বাড়িয়ে দেখলেন তারপর মন্থর গতিতে নেমে এলেন নীচে।

: বৌমা !

: মা ! রান্নাঘরের মধ্যে কল্যাণী ঠুকঠাক কিছু একটা করছিল, হাত ধুয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

: বলছিলাম, তাঁর তো আসবার সময় হোলো, দরজাটা খুলে রাখতে বলো। দরজা খোলা না পেলে তো আবার এক কাণ্ড হবে। ধুমাধুম চিৎকার আরম্ভ হয়ে যাবে 'বাড়ী ঢুকতে দেওয়া এদের ইচ্ছে নয়' বলে।

: বলি। মহেন কোথায় গেল ?

এদিক ওদিক দেখে কল্যাণী নিজেই গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে এলো।

বিমলা দেবী বিরক্ত হলেন বেশ।

: সদর দরজা খোলা কি তোমার কাজ মা ? এতগুলো লোকজন রয়েছে, তুমি বড়ো আস্কারা দাও ওদের, তোমাকে তাই পেয়েও বসে সব !

দুপা এগিয়ে গিয়ে উঁকি মারলেন তিনি।

: রান্নাঘরে আবার তুমি কি করছিলে ? ঠাকুর, সরলার মা ওরা গেল কোথায় ? রান্না করা তো তোমার কাজ নয়, তুমি শুধু তদারক করবে।

: তাই তো করি মা! রান্না তো আমি করি না, শুধু একটু দেখা-শুনা করি মাত্র। ওরা একটু গেছে দেশের লোকের সঙ্গে দেখা করতে—আমাকে বলে অনুমতি নিয়েই গেছে। রান্নাবান্না সব করে সেরে ঘরে রেখে গেছে, আমি শুধু পরিবেশনটুকু করে দেব। আচ্ছা মা, বারোটা তো বাজে, বলছিলাম কি একেবারে খেয়ে নিলে হয় না? ওর সেই মিষ্টিতে বেড়ালে মুখ দিয়েছিল, সে তো ফেলে দেওয়া হয়েছে। এলে ভাতই দেব একেবারে না হয়।

: ভালো বোঝো মা করো। লোকজনদের আক্কেলও বাবা বলিহারী—গেরস্থবাড়ীতে দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার সময়ে তাদের দেশের লোকের জন্যে দরদ উথলে উঠলো একেবারে। তিনি আবার ভাত খেতে চাইলে হয়। ঐ তো এসে পড়লেন।

সত্যিই একটা বৃহৎ বাস এসে বাড়ীর সামনে থামলো। বিমলা দেবী তাড়াতাড়ি পাশের ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। উনিশ, কুড়ি বছরের একটি তরুণী বাস থেকে নামলো লাফাতে লাফাতে – সর্পিল দুটি দীর্ঘ বেণী দুলছে দুদিকে—হাতে বই খাতা।

: মহেন্, আমি এসে গিয়েছি—এখন দরজা বন্ধ করে দাও। উচ্চ চিৎকারে বাড়ী সরগরম করতে করতে তরুণীটি ঢুকলো ভেতরে।

কল্যাণী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে এলো।

: তুমি কেন গেলে? মহেন কোথায়? পর্ণা তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো।

: চুপ চুপ, ভাই, আস্তে। কল্যাণী অনুনয় করে।

: মহেনের ছোটো ভাইয়ের আজ ছ'দিন হোলো বড়ো অসুখ—সে গেছে তাকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে। আর ঠাকুর গেছে তার দেশের লোকের কাছে—সরলার বাড়ীতে সে লোক এসেছে বলে সরলার মাও গেছে। দেশ থেকে আসে বেচারীরা কত কষ্ট করে আর একবার

দেখা করা মাত্র—সকলকে এক সঙ্গে ছুটি দিয়েছি শুনলে মা রাগ করবেন, মহেনের কথা তাই বলিনি মাকে।

: বেশ করেছো। রাগ করাই তো উচিত। তা তুমি আমাকে বললে না কেন একেবারে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসতাম। তুমি কিন্তু আমাকে বড়ো প্রশ্রয় দাও। যাকগে—খাবার দাও। হাতের বইগুলো দালানের কোণের টেবিলটার 'পরে ছুঁড়ে ফেললো পর্ণা।

: একটা কথা শুনবি পর্ণা ?

: বলো ! তোমার কোন কথাটা আমি না শুনি ?

: বলছিলাম তুই যদি একেবারে ভাত খেয়ে নিস্ তো আমার খুব সুবিধা হয়। ঠাকুর তো নেই, আমিই পরিবেশন করবো। এখন যদি তুই খাবার খাস তো ভাত খেতে পারবি না। একটার সময়ে তোকে ভাত দিতে আমাকে আবার নামতে হবে : এখন খেলে একেবারে পাট চুকে যেত।

: আচ্ছা, তুমি ভাত বাড়ো, আমি শাড়ী জামা বদলে হাত মুখ ধুয়ে আসছি। একটা গানের কলি গুণ গুণ করতে করতে পর্ণা ওপরে ছুটলো। ওর বোধ হয় আজ মেজাজ ভালো আছে। যাক – কল্যাণী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। একটা ফাঁড়া কাটলো যেন।

কিন্তু অত সহজে ফাঁড়া কাটবার অদৃষ্ট কল্যাণীর নয়। সকাল বেলাটা সুশৃঙ্খলে কাটলেও ফ্যাসাদ বাধলো বিকেল বেলা। সরলার মা এলোই না সারাদিন—মেয়ের বাড়ীতে ও থাকবে আজ, বড়ো বৌদিদি যেন রাগ না করেন, ঠাকুরের মুখ দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন তিনি। তাও ঠাকুর এলো তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। সরলার মা অনেক দিনের পুরোনো লোক—সব কিছু গুছিয়ে করতে পারে কিন্তু ঠাকুরটা একেবারে আনাড়ী আর ছেলেমানুষ। পুরোনো ঠাকুর মারা যাওয়াতে সরলার মার কাকুতি মিনতিতে কল্যাণী ওকে রেখেছে। সরলার মার ভাগ্নে

হয় নন্দ ঠাকুর। কল্যাণী পদে পদে ওকে সামলায়। আজও অত বেলা করে এসেই এক অপকর্ম্ম করে বসলো।

একা হাতে সব ভার পড়েছে, বিব্রতা হচ্ছিল কল্যাণী—পর্ণা বিকেলে শুধু স্যাণ্ডউইচ খায়, ওর স্যাণ্ডউইচ তৈরী করছে এমন সময়ে বিমলা দেবী ডাকলেন। স্যাণ্ডউইচ ক'টা তাকের ওপরে কোনোমতে রেখেই কল্যাণী ছুটলো—মিটসেফে রেখে যাওয়ার ফুরসৎ মিললো না। আর ইতিমধ্যে ঠাকুর রান্নাঘরে ঢুকে তাকের থেকে চাল পাড়তে গিয়ে স্যাণ্ডউইচের প্লেটটা দিলে উপুড় করে ফেলে একেবারে ফ্যান-গালা নর্দমাটার ভেতরে। শব্দ পেয়ে কল্যাণী ছুটে এলো কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে। ওদিকে পর্ণা খাবার চাইছে—নতুন করে রুটি আনিয়ে তৈরী করবার সময় নেই আর—এক মিনিট খাবার দিতে দেরী হলে ও মেয়ে দাঁতে দাঁত টিপে থাকবে একেবারে। এক মিনিট স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো কল্যাণী, নিজের হাতে সযত্নে গড়া স্যাণ্ডউইচগুলোর ক্লেদাক্ত মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে। তারপর এজমালী জলখাবার নিমকি সিঙ্গাড়া খানকতক প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি কল্যাণী নিজেই হাতে করে ওপরে উঠে গেল।

দোতলার চওড়া দালানেতে বিমলা দেবীর ঘরের সামনে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসে পর্ণা আর টুকুন্ ক্যারম্ খেলছিল—কল্যাণীকে খাবার নিয়ে আসতে দেখে পর্ণা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো একটু—: বা রে, খাবার চাইছিলাম বলে কি এক্ষুনি খাবো বলেছি? তুমি কেন হন্তদন্ত হয়ে নিয়ে আসতে গেলে কষ্ট করে? আমাকে একটিবার ডাকলেই তো আমি নীচে গিয়ে খেয়ে আসতাম!

হাত বাড়িয়ে কিন্তু কল্যাণীর হাত হতে খাবারের ডিস্‌টা নিয়েই ওর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো।

: ও এইজন্যেই বুঝি তুমি নিজে হাতে করে নিয়ে এসেছো। জানো তো আমি এসব খাই না। কেন, আমার রুটি গেল কোথায়?

ঃ পর্ণা লক্ষ্মী বোনটি আমার, আজকের মতো খেয়ে নে ভাই। কল্যাণী বসে পড়লে ওর পাশে।

ঃ সব দোষ ভাই আমার, তুই আমায় যা খুসী বল্—একদম মনে ছিলো না, করতে ভুলে গিয়েছি। দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিনা!

ঃ কই মা, আমি যখন ইস্কুল থেকে এলুম দেখলুম নীচে তুমি রুটি কাটছিলে তো!

টুকুন প্রতিবাদ করে সজোরে।

ঃ তোমার তো আমাকে করে খাওয়াবার কথা নয়, তোমার দোষ হবে কেন! ঠাকুর আর সরলার মা দুজনকেই একসঙ্গে ছুটি দিয়ে রাখা হয়েছে যাতে আমার খাবার তৈরী না হয়। শ্বশুরবাড়ী আর কাকে বলে! এই না হলে আর শ্বশুরবাড়ী—খেতে দেবে না কিছু না! চাই না আমি কিচ্ছু, খেতেও চাই না, কিছু করতেও চাই না, —দরকার নেই আমার কিছুতে। বাবা, মা যখন দিয়েছেন বিদেয় করে তখন এইখানেই শুধু এককোণে পড়ে থাকবো মুখ গুঁজড়ে। প্রায় কেঁদে ফেলে পর্ণা।

ঃ বিকেলে স্যাণ্ড্উইচ্ ছাড়া আমি আর কিছু খাই না সব জেনে শুনে—দাঁড়াও তো দেখে আসছি আমার ভাগের রুটি কেটে কাকে আবার বিলোনো হোলো—একছুটে পর্ণা নীচে চলে গেল। কল্যাণী ওকে বারণ করবার অবকাশও পেলে না একবার। ব্যথিত মুখে টুকুন অনুযোগ করে—ঃ কেন মা তুমি তখন কাকীমার রুটি কেটে অন্য লোককে দিয়ে দিলে? দেখো তো, কাকীমার খাওয়া হোলো না। —কল্যাণী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। শৈলেশ্বরের ছেলেই এ কথা বলছে, তিনি যখন এসে শুনবেন—

নীচে উঠোনের কলতলায় সুবাসিনী ঝি বাসন মাজছিলো। ঠিকে হলেও অনেকদিন সে এ বাড়ীতে কাজ করছে—অত্যন্ত মুখরা।

সকাল, বিকাল দুবেলার ব্যাপারই সে জানে ; পর্ণাকে দেখেই গরগরিয়ে উঠলো -ঃ দেখো বৌদিমণি, কতবার বলেছি ও নন্দ ছোঁড়াকে দিয়ে কিছু হবে না কাজকর্ম্ম। তা বৌদিদি ভালোমানুষ, আমার কথা তো কানে নেবেন না। সারাদিন তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়ে চেড়িয়ে এলেন, এসেই কিনা অপকম্ম! বৌদিদি বেচারা খেটে খেটে হায়রাণ সারাদিন। তা মুখে 'রা'টি তো নেই—তোমার খাবার এই মাত্তর বৌদিদি তৈরী করে রেখে গেছে কি না গেছে নবাব এসেই দুম্ করে সে সব নদ্দমাতে বেসজ্জন দিয়ে বসে রইলেন। সকালেও তো ঐ মুখপোড়া তোমাকে খেতে দেয়নি—ইস্কুল থেকে এসে তুমি যে মিষ্টি খাও সে তো সব ভালো করে চাপা দেয়নি, আলমারীতে রাখেনি, বেড়ালে খেয়ে গিয়েছিল। বেড়ালকে দিয়ে খাবার খাওয়ায় আ মর্ মিন্সে, মন যেন কোন মুল্লুকে চরে বেড়ায় নবাবের। খুব শিক্ষে দাও বেটাকে—দুবেলাই তোমার খাবার নষ্ট করলে, বৌদিদির কাজ বাড়ালে না হক্।

বিস্মিতা পর্ণা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। নর্দমা থেকে তখন অপরাধী স্যাণ্ডুইচ্‌গুলো পরিষ্কার করছিলো তাড়াতাড়ি হাত চালালেও সবগুলো ফেলে উঠতে পারেনি তখনো—পায়ের শব্দ পেয়ে পিছন ফিরেই বৌদিমণিকে দেখে আতঙ্কে তার মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল—এইবার মারই খাবে সে হয়তো!

কিন্তু আশ্চর্য্য! সব ভুলে নন্দ হাঁ করে তাকিয়ে রইলো, কই বৌদিমণি তো কিছু বলছেনা মারছেও না ধরছেও না!

কাদামাখা পাঁউরুটির স্লাইশ্‌গুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ততক্ষণে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে পর্ণার মুখেতে—ও, তাই আজ দুপুরে কল্যাণী ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে স্যাণ্ডুইচ করতে পারেনি—কোনো দিন দুপুরে যে ঘুমোয় না। তাই আজ সকালে বলেছিল, 'একেবারে ভাত খেয়ে নে নয়তো আমার কষ্ট হবে, আবার নেমে পরিবেশন করতে হবে',

তার দিদির কাজ করতে কষ্ট হয়েছিল এই জন্যে—কোনো কাজকেই যে ভয় পায় না।

লঘু পায়ে পর্ণা ফিরে গেল ওপরে।

বারান্দাতে কল্যাণীর গা ঘেঁসে বসে পড়ে আস্ত একটা শিঙাড়া মুখের ভেতর পুরে দিলে।

ঃ টুকুন্ তাড়াতাড়ি নে—সাড়ে পাঁচটা বেজে যাবে এক্ষুনি, তার আগেই গেম্‌টা শেষ করে ফেলতে হবে।

কল্যাণীর মুখে হাসি ফুটলো এতক্ষণে। পর্ণার পিঠে সস্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে স্নিগ্ধস্বরে বললে,

ঃ হ্যাঁরে, একটুতে এমন করিস্, তোর কি বয়স বাড়ছেনা, দিনদিন বড় হচ্ছিস না ?

ঃ বড়ো হচ্ছি বলে এমন কি অপরাধ করেছি যে খেতে পাবোনা ? বড়োরা বুঝি খায়না, খাবার কথা বলেনা ? সব সময়ে শাসন—এই চুপ্ চুপ্ বড়ো হচ্ছিস্ অতএব খাওয়ার সম্বন্ধে কোনো কথা বলবিনা ! বড়োরা খালি হাওয়া খায় আর ঢুক্ ঢুক্ করে ঢেঁকুর তোলে ! নন্দ, সরলার মা, মহেন, সুবাসিনী সকলকেই তুমি ঢালাও আস্কারা দাও—সকলেরই অবাধ স্বাধীনতা তোমার কাছে—যত শাসন খালি আমার আর টুকুনের বেলা, না ?

ঃ ওরা তো এমন দস্যিপনা করেনা তোর মতো সারাদিন ধরে !

ঃ বটেই তো ! ওদের দুরন্তপনা তো তোমার চোখে লাগবে না। ওরা তোমার পুষ্যিপুত্তুর যে ! আর আমি ? দস্যিপনা করবার জন্যে কতটুকু সময় আমি পাই বলো ? ভোরে উঠে তো কলেজ চলে যাই—সেই দুপুরে আসি। ভাতটাত খাওয়ার পরে একটুখানি তো মোটে আমি দুরন্তপনা করি আবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার থেকেই তো লক্ষীটি হয়ে থাকি সেই পরদিন সকাল অবধি।

তবে? আর ওরা যে সারাদিন সারারাত ধরেই দুষ্টুমি করে—একটুও কাউকে সমীহ না করে গণ্ডগোল পাকায় চব্বিশঘণ্টাই?

ঃ আচ্ছা—কলেজে গিয়ে তুই চুপ করে থাকিস্ কি করে ঐ ক'ঘণ্টা? আমার একদিন গিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। কিংবা হয়তো থাকিস্ই না চুপ করে—একদিন ক্লাস্ মেট একদিন প্রফেসর ধরে ধরে পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করিস কষে নিশ্চয়ই।

যতীশ্বরের গলা পাওয়া গেল নীচে। ফিরেছে কলেজ থেকে। পর্ণা হঠাৎ উঠে পড়লো সভয়ে। টুকুন ব্যস্ত হয়ে উঠলো ঃ কাকীমা, কাকীমা লক্ষীটি, আর এই দানটা খেলে যাও—গেমটা শেষ করবো এই দানেই।

কিন্তু পর্ণা ততক্ষণে উধাও।

কল্যাণী নিজের মনেই হেসে ফেললে। পর্ণা বলেছে ঠিক—বেচারা কতটুকুনি সময়ই বা পায় দুরন্তপনার বাবদে।

মর্নিং কলেজ—সকালে তো থাকেই না বাড়ী আর বিকেলে সত্যিসত্যি সাড়ে পাঁচটার থেকে শান্ত হয়ে যায় একেবারে। শৈলেশ্বর কোর্ট থেকে ফেরেন। যতীশ্বর ফেরে কলেজ থেকে, পর্ণাকে কেউ দেখতে পায় না আর। চুপিসাড়ে নিজের বইটই খান দুয়েক নিয়ে ও পালিয়ে যায় শাশুড়ীর ঘরে। পড়াশুনা করবার পাকা ব্যবস্থা করে নিয়েছে বিমলা দেবীর ঘরে। বিয়ের দানেতে বাবার দেওয়া ছোটো টেবিল আর চেয়ার একটা সুন্দর সেট্ করে বসে গেছে বিমলাদেবীর ঘরের পুব-দক্ষিণ দিকের কোণটাতে। যেন অর্ডার দিয়ে ঐ জায়গাটার মাপেই খাপ খাইয়ে তৈরী করা হয়েছিল। বিয়েতে উপহার পাওয়া টেবিলল্যাম্পগুলোর মধ্যেও বেছে বেছে সবচেয়ে সুন্দরটা নিয়ে এসেছে দোতলার এঘরে।

বাড়ীটা বড়ো যথেষ্ট। সামনে মস্ত গেট, পিছন দিকে একটু লন্‌মতো আছে। একতলায় চওড়া উঠোন—ছোটো পরিবার, বাড়ীর কারুর

একতলায় থাকবার দরকার হয় না। চাকর বাকরেরা থাকে একতলায়। পুজোর ঘর, রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাবার ঘর, কুকুর থাকবার ঘর, বাথরুম ইত্যাদি একতলাতে। দোতলাতে চারখানা ঘর—বিমলা দেবীর ঘর, টুকুনের খেলার সরঞ্জাম থাকে একটা ঘরে; আত্মীয় কুটুম্ব কেউ এলে গেলে থাকে একটাতে, বাকী ঘরখানা সিন্দুক ঘর। বিমলা দেবীর ঠাকুরও থাকেন ঐ সিন্দুক ঘরের এক কোণে। তিনতলাতেও চারখানা —যতীশ্বরের দুখানা, শৈলেশ্বরের দুখানা ঘর। সব সমান ব্যবস্থা। সব আসবাব পত্র তিনতলার ঘরে রেখে এসে পর্ণা দোতলাতেই আস্তানা গেড়েছে। বিমলা দেবীর অসুবিধা হয় খুব—তাঁর চিরকালের অভ্যাস সন্ধ্যাবেলা নির্জন ঘরে বসে সুর করে ভাগবত পাঠ করা। এখন তা করতে পারেন না পর্ণার যদি পড়ায় ব্যাঘাত হয়। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে মালা জপতে তাঁর খুব ভালো লাগে কিন্তু পর্ণার টেবিলের আলোটা জ্বলে অনেক রাত অবধি। মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলতে পারেন না।

শাশুড়ীর অসুবিধার কথা কল্যাণী বুঝতে পারে। এগারো বচ্ছর তার বিয়ে হয়েছে—শাশুড়ীর প্রতিটি খুঁটিনাটি অভ্যাস তার নখাগ্রে। কতদিন সে পর্ণাকে বলেছে তিনতলার ঘরে গিয়ে পড়াশুনা করতে। কিন্তু পর্ণার সেই এক জবাব: উঁহু—মার একটু অসুবিধা হয় আমি এঘরে পড়লে বুঝলুম কিন্তু মা তো মোটে একজন লোক আর আমি যদি ওপরে যাই তো দুজন লোকের অসুবিধা হবে যে ভীষণ। প্রফেসর সাহেব নিজের মনে পড়াশুনা করেন, আরেকজন কেউ থাকলে বিরক্ত হন্ আর আমারও পড়া হয় না আন্‌কা জায়গায়। আর ওঘরেও দাদা ব্রিফ টিফ দেখেন, ও ঘরেও যদি যাই দাদার অসুবিধা হবে। তার চেয়ে এই ভালো। দুজন লোকের অসুবিধা হওয়ার চেয়ে একজন লোকের হওয়াই তো শ্রেয়। ছেলেমেয়ের জন্যে মায়েদের চিরকালই ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

আর তো—বি, এ পরীক্ষাটা অবধি। একটা বছর মাত্র, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

ঃ তার মানে? পাশ করলে এম, এ, পড়বি না তুই?

ঃ মাথা খারাপ! এইতেই আমার আধ হাত জিভ বেরিয়ে পড়েছে—এখন থেকেই ভাবছি, পরীক্ষার 'হলে' অতক্ষণ একভাবে বসে থাকবো কি করে? দুবার পরীক্ষার সময়ে যা যম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। বাব্বাঃ!

মুখে ও কথা বললেও সকলেই জানে—ভালো ছাত্রী পর্ণা, লেখাপড়াতে ওর আসক্তি যথেষ্ট। তার আর একটা কারণও আছে। পাছে প্রফেসর সাহেব টেনে নিয়ে পড়াতে বসেন সেই ভয়ে ও আগে ভাগেই খুব মন দিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করে দেয়—কোনো ত্রুটি ধরবার অবকাশ রাখে না।

দুপুরের দিকে ঝিমোচ্ছে সারা বাড়ীটা। পর্ণা নেই আজ—কলেজ থেকে ফিরে কোনোমতে দুটো খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। দিবানিদ্রার অভ্যাস বিমলা দেবীর কোনো কালেই নেই। খাওয়া দাওয়ায় পাট চুকে গেছে। দালানে বসে রেডিয়ো শুনতে শুনতে কল্যাণী এম্‌ব্রয়ডারী করছে একটা। মালাটা হাতে করে বিমলা দেবীও গিয়ে বসলেন সেখানে। পর্ণা গান গাইছে—ইথারের স্তরে স্তরে তরঙ্গ স্থষ্টি করে সে গানের স্পন্দন কানে এসে পৌছচ্ছে। এই ব্যাপারটা বিমলা দেবীর কেমন ঠিক পছন্দ হয় না। ভালো গান গাইতে পারা খুবই ভালো—ঈশ্বর দত্ত শক্তি সেটা কিন্তু তাই বলে সেই গান রেডিয়োতে গিয়ে গেয়ে পয়সা নিয়ে আসা—এ যেন শিল্প লক্ষ্মীকে সস্তা বাহবার মোহে বিক্রী করে দেওয়া।

কিন্তু যথেষ্ট রাশ ভারী আর আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতির মানুষ তিনি—কথায় কথায় খুঁটিনাটিতে নিজের মতামত জাহির করে আত্ম-

মর্য্যাদাকে খেলো করেন না। মনে পড়লো, মেয়ে পছন্দ করে এসে শৈলেশ্বরের কি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ঃ—জানো মা, যতীর জন্যে যা বৌ ঠিক করে দিচ্ছি এমন চৌকস মেয়ে দুর্ল্লভ—রূপ আছে, গুণ আছে, বিদ্যা আছে মা-বাপের একমাত্র সন্তান আর কি চমৎকার গান গায় মা কি বলবো!

বিয়ের আগে ও কলেজে পড়তো ওদের ওদিককার কলেজে—এখনো পড়ে, এদিককার কলেজ বদলে নিয়েছে। বিয়ের আগে ও রেডিয়ো রেকর্ডে গান দিতো—এখনো দেয়। শ্বশুর বাড়ীতে সব বিষয়ে প্রশ্রয়ই পেয়ে আসছে পর্ণা—ওর গানের কদর এখানে যথেষ্ট তাই জেনেই ও নিশ্চিন্ত।

বিমলা দেবীর অনুক্ত অমতের কথা জানতে পারতো যদি ও তাহলে কি হতো বলা যায় না। কি আবার হোতো, চীৎকার আরম্ভ করে দিত, কেন অমত হবে—ঝগড়া করতো তাই নিয়ে। সত্যি কি শ্বশুর বাড়ীই পেয়েছে পর্ণা—অপরিণতমনা মেয়ে তাই বুঝতে পারছে না এ কত বড়ো পাওয়া। তাঁদের আমলের শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে এখনকার মেয়েদের শ্বশুর বাড়ী তুলনা করলে···এই তো, আজকে পর্ণার সিটিং আছে বলে দুই ছেলে কলেজে আর কোর্টে ট্রামে করে গেছে—ড্রাইভার বারোটার থেকে এসে বসে আছে, কল্যাণী আবার তাকে এখানেই খাইয়েছে দুপুরে আটকা থাকবে বলে। গাড়ী পর্ণাকে নিয়ে গেছে—প্রোগ্রাম শেষ হলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। দুপুরে ওর থাকে না কখনো—আজ দুপুরে পড়েছে বলেই একটু অসুবিধা হয়েছে। এই আদর পর্ণা পাচ্ছে আর তাঁদের সময়ে······

কিন্তু সত্যি চমৎকার গায় পর্ণা—সমস্ত প্রাণের দরদ ঢেলে আবেগ মিশিয়ে এক মনে কি করে গায় ও! গানের সুরটা করুণ—শুনলে মনে হয় কোনো এক লক্ষ্মীশ্রী সম্পন্না ব্যর্থ জীবনা নারী বিড়ম্বিত অন্তরের অর্ঘ্য উজাড় করে দিচ্ছে ভগবানের পায়ে।

পর্ণা কেন এ গান গায় ?

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পর্ণা ফিরে এলো সোরগোল তুলে। সদর দরজা থেকেই চীৎকার : দিদি, আমার গান শুনলে ? কেমন হয়েছে ? পাশের বাড়ীর এক মহিলা বেরিয়ে এলেন—বেশ হয়েছে মা, বেশ ভজন গাও তুমি। : হুঁ ! পর্ণা তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে এলো, প্রতিবেশিনীদের ও বিশেষ সহ্য করতে পারে না। দোতলায় বিমলা দেবীর ঘরে এসে ঢুকলো পর্ণা। মহিলাটিও তার পিছনে পিছনে এলেন ; বিমলা দেবীর সঙ্গে সংসারের দুটো সুখ-দুঃখের কথা কয়ে দুপুরটা কাটানোর উদ্দেশ্যেই তাঁর আসা। কল্যাণী শেলাই ফেলে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল : তোর দ্বিতীয় বারের গান দুখানা কিন্তু আমার বেশী ভালো লাগলো রে।

পঁয়তাল্লিশ টাকার চেক্‌খানা ব্যাগ্‌ থেকে বার করে পর্ণা বিমলা দেবীর পায়ের কাছে রাখলে। বাপের বাড়ীতে থাকাকালীন প্রোগ্রাম্ পড়লে সে টাকা ও নিজের ইচ্ছামতোই খরচ করে। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে থাকা অবস্থায় এই ওর চতুর্থবার প্রোগ্রাম্ পড়লো। প্রথমবার টুকুনকে দিয়েছিল দ্বিতীয়বার কল্যাণীকে. তৃতীয়বার শৈলেশ্বরকে আর এই চারবারের বার। বিমলা দেবীকে দেওয়ার কথা ওর এর আগে অনেকবার মনে হয়েছে কিন্তু কেমন একটা লজ্জা এসে বাধা দিয়েছে। আজকে ও জোর করে সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলেই এসেছে।

কিন্তু বিমলা দেবী কেমন অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন। মনের ভাব সাধারণতঃ তিনি দমন করেই থাকেন।

আজকে প্রতিবেশিনীটির উপস্থিতি সব কেমন গোলমাল করে দিলে। হাত দিয়ে চেকটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন তিনি।

: কি দরকার বাছা আবার আমাকে দেবার। নিজে রোজগার করে এনেছো নিজেই নাও না ! খুসীমতো খরচ করো। তোমার

গানের কোনো কথাতেই তো আমি নেই মা—কেন আর চেক্ দিয়ে শুধু শুধু নিমিত্তের ভাগী করা ?

কল্যাণী প্রমাদ গুণলে।

অভিমানে পর্ণার গলা বুজে এলো। প্রায় ফুলতে ফুলতে ও বললে,

ঃ তার মানে ? রেডিয়োতে গান দেওয়া আপনি এতই অপরাধ মনে করেন যে তার দরুণ টাকা নিলে আপনাকে নিমিত্তের ভাগী হতে হবে ?

ছেলেমানুষী সব সময়ে ভালো লাগে না।

বধূর এই ঔদ্ধত্য, মুখে মুখে জবাব করা বিমলা দেবীর পক্ষেও সহ্য করা সম্ভব হোলো না। তীব্র স্বরে তিনি জবাব দিলেন,

ঃ আমি কি মনে করি বা না করি সে কৈফিয়ৎ কি আজ তোমাকে দিতে হবে নাকি ? শাশুড়ীকে খুব সম্মান করতে শিখেছ দেখছি !

ব্যাপার দেখে প্রতিবেশিনীটি পা পা করে সরে পড়লেন।

দুর্দ্দান্ত বৌয়ের জ্বালাতে দুপুরের গল্পের আসরটা মাটি হয়ে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো পর্ণা। কটুবাক্য শোনা ওর অভ্যাস নয়—ফুঁপিয়ে কাঁদছে তখন রীতিমতো—

কিন্তু তবুও ছাড়বার পাত্রী ও নয়।

ঃ শাশুড়ীকে সম্মানই তো করতে গিয়েছিলাম—শাশুড়ী যদি ভালো না হয়, লক্ষ্মীকে ঠেলে ফেলে দেয় তো আমি কি করবো! টাকাকে কি অমনি করে অসম্মান কয়তে হয় ? কি কপাল আমার, কি শ্বশুরবাড়ীই হয়েছে ! এমন ভাগ্য, এবাড়ীতে আমি পা দেবার আগেই শ্বশুর গেলেন দুম্ করে চলে। থাকতেন যদি তিনি আর ইনি যেতেন তাঁর বদলে তো খুঁজে-পেতে শ্বশুরের আবার বিয়ে দিয়ে মনের

মতন চমৎকার একটি শাশুড়ী নিয়ে আসতাম্। সে শাশুড়ী পছন্দসই হোতো, খুব আদর করতো আমাকে নিশ্চয়ই।

অমন যে বিমলা দেবী—রাগ ভুলে হাসতে হাসতে মুখে কাপড় দিলেন তিনিও।

ঃ কি করবো বলো মা—সৎশাশুড়ীর আদর খাওয়া আর তোমার অদৃষ্টে লেখা নেই, কাকে দোষ দেবে? কর্ত্তা যে গেলেন চলে—অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে পোড়া আমি যক্ষির মতো সব আগলে বসে আছি বিধাতা তোমার ওপরে অবিচার করেছেন বলেই না!

পর্ণা সাহস সঞ্চয় করে এক পা এক পা করে আবার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

ঃ চেক্‌টা যে উড়ে যাচ্ছে মা, ধরুন্ ওটাকে।

হাত বাড়িয়ে পলায়মান নীলাভ কাগজখানাকে মুঠোর মধ্যে আটকে ধরলেন বিমলা দেবী।

ঃ ভালো কথাই তো বলছিলাম—তোমাদের এখন অল্প বয়স, কত রকম শখ আহ্লাদ, খরচও কত বেশী, তাই তোমাকেই নিতে বলছিলাম। নাও, আমাকে তো দেওয়া হয়েছে এবার আমি আবার তোমাকে দিচ্ছি, বুড়ো হয়ে মরতে চললুম আমার তো আর কোনো শখ নেই আর ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমরা তো আর আমার কোনো অভাব রাখোনি যে টাকার দরকার হবে? বুড়োবয়সে কি লোক হাসাতে খেলনা কিনতে বসবো?

শাশুড়ীর কোলের কাছ ঘেঁসে বসে পড়লো পর্ণা।

একটু আগের দুচোখের জলের ধারা শুকিয়ে এসেছে এতক্ষণে।

ঃ মার যেমন কথা! টাকার আবার দরকার কার কখন না হয় শুনি! কেন এই যে ঠাকুরের সিংহাসনের ছত্রটা ভেঙ্গে গেছে, ওটা মেরামত করে

নিলে তো হয়!—দেখি দেখি ওমা! আবার কতগুলো পাকাচুল গজিয়ে উঠেছে। এই সেদিন তো সব নির্ম্মূল করে তুলে দিলুম।

চেক্‌টা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বিমলা দেবী সস্নেহে বললেন, ঃ আচ্ছা হয়েছে, একবার চুল তুলতে বসলে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, চুল তোলার নাম করে মাথা টেপার নানা কসরৎ করতে করতে তো সন্ধ্যে উৎরে যাবে। যা আগে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে বৌমার কাছ থেকে জলখাবার নিয়ে খেয়ে আয়—তারপর সেবা করতে বসিস্'খন।

যতীশ্বর সেদিন ফিরলো কলেজ হতে সকাল সকাল। ইন্টার স্পোর্টসে ছাত্রদের টিম্ ট্রফি পেয়েছে তারই দৌলতে হাফ-ডে হয়ে গেল। সিনেমা দেখতে গেলে হয়! কিন্তু ভালো লাগে না একা একা। মুস্কিল হয়েছে যতীশ্বর ছোটোবেলা হতেই বড়ো গম্ভীর আর স্বল্পভাষী। বন্ধু, বান্ধব, ক্লাব, আড্ডা কোনো কিছুর বালাই নেই তার কোনোদিন। বিয়েতে একেবারে মত ছিলো না ওর, নেহাৎ মা আর দাদার অনুরোধে পড়ে বাধ্য হয়ে রাজী হতে হয়েছিল। শ্বশুর বাড়ীর গোষ্ঠী—শালা, শালী, শালাজ প্রভৃতির কথা মনে হলেই ওর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—স্ত্রী না হয় তবু ঘর করে করে নিজের লোক হয়ে যায় কিন্তু ঐ সব কতকগুলো কোথাকার কে, জন্মে পরিচয় ছিলোনা যাদের সঙ্গে, এক রাত্রের সম্পর্কের দাবীতে পরেদের একটা ছেলের ওপর অত্যাচার করতে বাধে না তাদের কোথাও এতটুকু—বাংলাদেশে পাঠান রাজত্বের আমলের মতো নতুন জামাইদের সঙ্গে যেন তাদের অত্যাচারী আর অত্যাচারিতের সম্বন্ধ কেবল। রক্তের সম্পর্ক নেই যাদের সঙ্গে তাদের কোনোরকম আত্মীয়তা যতীশ্বর বরদাস্ত করতে পারে না। ঐ স্ত্রী শালা শালী তো যে কোনো লোকেরই হতে পারতো—সম্বন্ধ করে বিয়ে, মিললে জুললে তো সব লোকের সঙ্গেই হওয়া সম্ভব। জন্মমুহূর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার যে

বাঁধনে বাঁধা পড়ে যায় নবজাতক, রক্তের ধারার অক্ষয় গণ্ডীতে তাকেই একমাত্র অস্বীকার করা চলে না কোনোমতে। তবু রক্ষে, তার স্ত্রী মা বাপের একমাত্র সন্তান।

যতীশ্বর অনেক স্ত্রী দেখেছে—এদিক ওদিক, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের স্ত্রী। দেখেছে কেমন চোখ বুজে অথবা দুদিন আলাপ করেই লোকে অজানা বা অল্পজানা পরিবারের মেয়ে বিয়ে করে আনে—লঘু প্রকৃতির চটুল মেয়েগুলো স্বামীর ঘাড়ে চড়ে খায়—কোন্ মন্ত্রে স্বামীগুলোকে বশ করে করে প্রভুত্ব করে ইচ্ছামতো। যতীশ্বরের প্রতিজ্ঞাই ছিলো তাই, বিয়ে যদি করতে হয় কখনো, স্ত্রীকে এক তিল প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। তাই সে করেওছে।

ফুলশয্যার রাতে সদ্য আই-এ পরীক্ষা দিয়ে ওঠা নববধূকে যতীশ্বর ইকনমিক্‌সের লেস্‌ন্ দিয়েছে—পাশ করে বি, এ, পড়বার সময়ে তাকে ইকনমিক্‌স কমবিনেশান্ নিতে হবে তারই পত্নী স্বরূপ।

কিন্তু এর যে বিপরীত দিকও আছে তা যতীশ্বর ভেবে দেখেনি। পর্ণাও যে সেই ভয় পেয়ে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলে। কি জ্বালা— স্ত্রীকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না এটা ঠিক কিন্তু প্রশ্রয় পাবার জন্যে স্ত্রী যদি আবদার না করে, যদি একেবারে কাছেই না এগোয় তাহলে কি করা যায়? এ স্ত্রীর সঙ্গে কেমনতরো ব্যবহার করা চলে অনভ্যস্ত যতীশ্বর ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না।

আজও তাই সিনেমার কথা মনে হতেই ও ভাবলে বৌকে নিয়ে গেলে কেমন হয়? বিয়ের পর বৌকে নিয়ে সিনেমাতে তো ও যায়ই নি বিশেষ—বছর ঘুরতে চললো বিয়ে হয়েছে এখন নিয়ে গেলে কেউ তেমন কিছু মনে করবে না বোধ হয়।

নিঃশব্দে বাড়ী ঢুকলো যতীশ্বর। মহেন দরজা খুলে দিলে, নীচে কেউ নেই, সব ওপরে চলে গেছে খেয়ে দেয়ে। সোজা তিনতলায়

নিজের ঘরে উঠে গেল যতীশ্বর। ঘরে আর কেউ নেই—খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে পর্ণা বোধ হয় গল্পের বই পড়ছে, মুখটা ওপাশে ফেরানো।

: অপর্ণা !

চমকে উঠলো পর্ণা। ধড়মড় করে উঠে বসলো ও—এ সময়ে যতীশ্বরের আসাটা একেবারেই আকস্মিক।

: ছুটি হয়ে গেল সকাল সকাল। তাই চলে এলাম। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের একটা ভালো ছবি এসেছে এলিটে—তোমাকে দেখিয়ে আনবো চলো।

: দিদিকে বলে আসি। মৃদুস্বরে কথাকটা বলেই পর্ণা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। ওর মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

দোতলায় কল্যাণী একমনে টুকুনের ঘর গোচাচ্ছিলো—পর্ণা হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকলো।

: দিদি, প্রফেসর সাহেব এসেছেন।

: কেন রে ? এমন অসময়ে ? ভীত দৃষ্টিতে কল্যাণী ফিরে তাকালো।

: আঃ অত ভয় পাচ্ছ কেন ? ঐ করে করেই সকলের মাথা খেয়েছ তুমি। এমনি ছুটি হয়ে গেল তাই। তোমাকে তৈরী হতে বলে পাঠালেন – সিনেমা নিয়ে যাবেন।

: আমাকে সিনেমা নিয়ে যাবার জন্য তো অ্যাড্‌ভোকেট্ সাহেবই রয়েছেন—আবার প্রফেসর সাহেবের কি দরকার ?

: আঃ ঠাট্টা রাখো দিদি।

যতীশ্বর ঘরে এসে ঢুকলো। পর্ণার মুখ শুকনো হয়ে যাওয়া আর ওরকম আকস্মিক অন্তর্দ্ধানেতে কেমন একটা খটকা লাগাতে পর্ণার পিছন পিছন নেমে এসে সেও নিঃসাড়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিলো। পর্ণার কথাগুলো শুনতে পেয়ে এমন একটা বিরক্তি এলো—এত কি

স্পর্দ্ধা সাহস আর তেজ ও মেয়ের যে স্বামীর প্রতি আনুগত্য আসতে পারে না? কিন্তু বাইরে সে কথা প্রকাশ করা চলে না। মুখে হাসি টেনে আনতে হোলো, তাই,

: হ্যাঁ বৌদি, তৈরী হয়ে নাও চটপট্ বেশী সময় নেই আর চমৎকার ছবি। অপর্ণা, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, আর কোনো অ্যাপয়েন্ট্মেন্ট না থাকে তুমিও তো যেতে পার!

মুখ নীচু করে সুবোধ বালিকার মতে পর্ণা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়লে সম্মতিসূচক। আর এতক্ষণ পরে ওর নত মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যতীশঙ্করের মনের বিরক্তি মুছে গিয়ে মন এক অব্যক্ত বেদনায় ভরে উঠলো। না, পর্ণা সুখী হয়নি। অমন হালকা উচ্ছল প্রকৃতির মেয়েটির যোগ্য স্বামী আর যেই হোক্ যতীশ্বর নয় এটা ঠিক। ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে ওর মনটাও মাষ্টার হয়ে গেছে—বিয়ের সম্বন্ধে ও একতরফা বিচারই করে রেখেছিল। না, মেয়েরা অত লঘু প্রকৃতির নয়। পর্ণা এখনো এত ছেলেমানুষ আছে—ভগবানের এটা একটা কত বড়ো আশীর্ব্বাদ। পর্ণা পছন্দ করেনি তাকে, করতে পারে না···

অত গূঢ় মনস্তত্ত্বের ধার ধারে না কল্যাণী—ও কিছুই বুঝলে না, খুসীমনে তৈরী হতে চলে গেল ওপরে।

পর্ণা বাপের বাড়ী চলে গেছে।

ছুটিতে ছুটিতে ও বাপের বাড়ী যায়—শ্বশুরবাড়ীর কাছের কলেজে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়েছে—কলেজ পিরিয়ড্টা তাই শ্বশুরঘর করতেই হয়, ছুটিতে সেটা কষে উশুল করে।

সুদীর্ঘ আড়াইমাস কলেজ বন্ধ এখন। মোটে চোদ্দো দিন হোলো গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন গেছে। টুকুন্ মনমরা হয়ে

ঘুরে বেড়ায় একা একা—কাকীমাই ওর একমাত্র অসমবয়সী বন্ধু, সাথী সঙ্গী সব কিছু। কাকীমা চলে যাওয়া অবধি ওর গলার আওয়াজও কেউ পায় না। সমস্ত দিন বাড়ীটা অস্বাভাবিক রকম শান্ত হয়ে থাকে—বিমলা দেবীর বড়ো অস্বস্তি লাগে, মনে হয় যেন বড় বৌ বড়ো বেশী শান্ত, বড়ো বেশী ধীরস্বভাবা। ও একটু চঞ্চল হলে যেন ভালো ছিলো। তিনি চিরকাল শান্তিপ্রিয় নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ—বড়ো ছেলের বিয়ে দেওয়ার সময়ে তাই মধ্যবিত্ত ঘরের আট ভাই বোনের বোন কল্যাণীকে পছন্দ করেছিলেন—লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্না মেয়েটি গাদার মেয়ে, সুবিধা আছে শান্ত স্বভাবের হবে, ধীরস্থির হয়ে সংসার করবে। কিন্তু শৈল পছন্দ করে যতীর বিয়ে দিলে, এক আদরের চুপ্‌ড়ী ঘরে এনে তুললো—যত গোলমাল তো বাধিয়েছে ঐ ছোটো বৌ এখন।

যতীশ্বরের কলেজের ছুটি হলেও কোচিং ক্লাস করতে যেতে হয় রোজই ঘণ্টা তিনেক করে। সেদিন কিন্তু কোচিং ক্লাসে যেতে যেতে মাঝপথে ফিরে এলো যতী। জ্বর আসছে।

বিমলা দেবী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যতীর এমনিতে সাধারণ স্বাস্থ্য খুব ভালো, কখনো অসুখবিসুখ করে না আর তার জন্যেই বিছানাতে যখন পড়ে ভোগায় খুব বেশী রকম। এবারেও ঠিক তাই হোলো।

সেই যে জ্বর এলো আর ছাড়তে চাইলো না কিছুতে। দ্বিতীয় সপ্তাহে ডাক্তার ধরলেন টাইফয়েড্—শক্ত টাইপের। রোগভোগ করতে করতে দিন দিন যতী দুর্বল হয়ে হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যেতে লাগলো প্রায়। তিনজন ডাক্তার নিয়মিতভাবে দেখতে লাগলেন। কিন্তু আর দেখার কি এ রোগে, শুধু ওয়াচ্ করে যেতে হবে সতর্কভাবে আর দরকার চব্বিশঘণ্টা সুষ্ঠু এবং উত্তম নার্সিং। সকলের মুখ শুকিয়ে গেছে, 'ডে অ্যাণ্ড্ নাইট' নার্স আনা হবে কিনা জল্পনা কল্পনা চলছে—এমন

সময়ে পর্ণা এসে পড়লো হুট্ করে। ওকে জানানো হয়নি ইচ্ছা করেই—কিন্তু কোথা থেকে খবর পেয়ে ছুটে এসেছে পর্ণা।

বিমলা দেবী বিরক্ত হলেন খুব : তুমি ছেলেমানুষ, কিছু বোঝো-সোজো না, রোগের বাড়ীতে এসে তোমার গোলমাল বাধানোর কি দরকার বাছা? ভগবান না করুন, তেমন কোনো দরকার পড়লে তোমাকে তো নিয়েই আসতাম।

পর্ণা এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কল্যাণীর কাছে সরে এলো, : নার্স রাখবার কি দরকার দিদি। নার্সদের মধ্যে প্রাণের অভাব খুব বেশী—লাইফ্‌লেস মেসিন্ এক একটা যেন। নিজেদের লোকের মধ্যে যে দরদ আছে, টান আছে······

মানে আপনার লোকেরা যত দরদ দিয়ে টেনে করবে, ভাড়া করা লোকেরা কি ঠিক তেমনটি করবে, বলো?

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে কল্যাণী তাকায় : তা আর কি করা যাবে বল্? নার্সেরা খুব কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় এটাও তো ঠিক, ঘড়ির কাঁটার এদিক ওদিক হতে দেয় না।

: তাও বটে আবার তেমনি যতক্ষণ টাকা দেবে ততক্ষণই তার কর্ত্তব্যজ্ঞান টনটনে থাকবে। সকলের হাতে সব সময়ে কিছু টাকা থাকে না—থাকলেও অসুখের বাড়ীতে নানান ভাবনা চিন্তায় সর্বদা সে খেয়ালও থাকে না—ব্যস! টাইম্ যেই ওভার্ হয়ে যাবে এক সেকেণ্ডের জন্যেও থামবে না—তা রোগীর শ্বাসই উঠুক আর যাই হোক।

: ষাট্ ষাট! তুই কিন্তু নার্সদের ওপর বড়ো অবিচার করছিস পর্ণা। তা কি করবি—সেকালের সতীলক্ষ্মীদের মতো আহার নিদ্রা ত্যাগ করে একমনে এক আসনে স্বামীর রোগশয্যার পাশে সেবা করবি বসে বসে—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে করে নিজের পরমায়ু দিয়ে সারিয়ে তুলবি ওকে?

ঃ দরকার হলে তাই করতে হবে দিদি ! আমার স্বামীর আজ এত বড়ো অসুখ, আমি স্ত্রী হয়ে যদি তাঁকে যথাযোগ্য সেবা শুশ্রূষা, দেখাশুনা না করি তো মহাপাপে পতিত হবো যে ! না দিদি, নার্স আনা চলবে না—বাচ্চার মা তুমি, তাছাড়া তোমার ঘাড়ে সারা সংসারের ভার—মা তো একেবারে নার্ভাস হয়ে গিয়ে কি রকম হয়ে পড়েছেন, আমিই করবো। ফার্ষ্ট এডের ট্রেনিং নেওয়া আছে আমার······ জানি সব······

অমন দুর্ভাবনার মধ্যেও কল্যাণীর হাসি এলো।

ঃ তুই যেন কি রকম বদলে গেছিস পর্ণা এই কদিনের মধ্যেই।

সত্যিই পর্ণা অসাধ্য সাধন করলে। শ্বশুর ঘর করতে এসেও সংসারের কুটোটি ভেঙ্গে যে কখনো দুখানা করতে পারেনি এ সেই পর্ণা। কোমল, সেবাপরায়ণ দুটি হাত চব্বিশ ঘণ্টা অক্লান্ত নিরলস সুনিপুণ পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হয়ে রইলো। বিমলা দেবী ঠাকুরের কাছে জোড়া পাঁঠা, বুকের রক্ত মানত করতে লাগলেন, শৈলেশ্বর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, কল্যাণীর মুখে হাসি ফুটলো, ডাক্তারেরা বিস্মিত হতে লাগলেন উত্তরোত্তর।

পর্ণার বাবা মা এসেছিলেন জামাইয়ের এত বড়ো অসুখ শুনে। তাঁরা অবধি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, পর্ণার এ রূপ তাঁরাও কখনো দেখেননি। এ যেন রোগাক্রান্ত স্বামীর শয্যাপার্শ্বে সেবাব্রতা নারীর তপস্যাসন—সমস্ত অন্তর উন্মুখ করে গাঢ় একাগ্র যোগিনীচিত্তের উপাসিত অবদান। যতীশ্বরের নিস্তেজ বিবর্ণ দেহ আস্তে আস্তে স্বাভাবিকত্ব প্রাপ্ত হোলো, নিষ্প্রভ ম্লান দৃষ্টি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, স্ত্রীর প্রতি সুগভীর প্রেমে ও কৃতজ্ঞতায় ওর দুই চোখের চাহনী সুকোমল স্নিগ্ধতায় প্লুত হয়ে উঠলো। বিয়াল্লিশ দিন পরে যতী ধীরে ধীরে বিছানার ওপরে উঠে বসলো।

কিন্তু এরকম আত্মবিস্মৃত সেবার ফল সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তাই হোল। পর্ণা শেষ হয়ে গিয়েছিল একেবারে। যতীশ্বর বিছানাতে উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গে পর্ণা বিছানা নিলে। দিন দিন পর্ণার অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো। ডাক্তারেরা অবাক হয়ে গেলেন : কি আশ্চর্য্য, স্বামীর অসুখের সময়ে এঁর এত মনের জোর ছিলো, এখন সে মনের জোর গেল কোথায়? পেশেন্টের নার্ভ একেবারেই সক্রিয় নয়, মানুষের আরোগ্য লাভ খানিকটা পরিমাণে তার ইচ্ছাশক্তির ওপরেও নির্ভর করে কিন্তু এ রোগীর বাঁচবার যেন কোন স্পৃহাই নেই।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে কল্যাণী এ অনুযোগ করলে। ক্ষীণ হাসলে পর্ণা—

: যমের সঙ্গে একবার লড়াই করেই আমার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে দিদি। দ্বিতীয়বার যুদ্ধের তোড় জোড় করে পুঁজি যোগাড় করতে পারার আগেই যম পেড়ে ফেললেন—আমি কি করবো বলো?

কল্যাণী তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে দিলে।

সেদিনই সন্ধ্যায় পর্ণা কল্যাণীকে একলা চাইলে কিছুক্ষণের জন্যে। ডাক্তারেরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন এখন, কেবল দৈবের অনুগ্রহের 'পরে নির্ভর। কল্যাণী ঝুঁকে পড়লো ওর মুখের ওপর—

: কি রে, কিছু বলবি নাকি পর্ণা?

: হ্যাঁ দিদি, চলে গেছেন তো সকলে?

: গেছেন কিন্তু এখন থাক্ না বোনটি, পরে বলিস।

: না দিদি, পরে আর আমার সময় হবে না। আমার জীবনের বোঝা তোমার কাছে লঘু করে হালকা হয়েই আমি ওপারে যেতে চাই, আশীর্ব্বাদ করো সেখানে যেন তৃপ্তি পাই, শান্তি পাই।

: কি যা তা বক্‌ছিস ভাই পাগলের মতো? ঘুমো দিকিনি খানিক-ক্ষণ চুপ করে! আমি মাথা ম্যাসেজ করে দিচ্ছি।

: না দিদিভাই—এ আমার প্রলাপ বকা নয়, আমি প্রকৃতিস্থই আছি।

: দিদি!

: কি রে?

: ইউরোপীয়ান্‌দের খুব ভালো প্রথা আছে, না? মৃত্যুর আগে ফাদার কন্‌ফেসরের কাছে সব কিছু খোলাখুলি স্বীকার করে যাওয়া—এ জন্মের দুষ্কৃতির বোঝা তারা এ পারেই ফেলে রেখে যায়—পরজন্মে তার জের আর টানতে চায় না।

: কি তুই বলতে চাস পর্ণা?

: যা বলতে চাই তা একবার শুনলে তুমি আর আমাকে ভালোবেসে আমার দিদি হয়ে থাকবে না দিদি। সত্যি, আর জন্মে তুমি আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে, এ জন্মে জায়ের ছদ্মবেশে দিদিই হয়ে এসেছো—তাই তো আমার নিজের বোন নেই এ জন্মে। পরজন্ম যদি থাকে সেখানেও তুমি আমার দিদি হয়ে থেকো, লক্ষ্মীটি!

: আচ্ছা থাকবো। তুই এখন চুপ কর দিকি!

: না দিদি, আমাকে বলতে দাও, কখন সময় হয়ে যাবে আমার আর কিছু বলা হবে না···

আর তা যদি হয়···উঃ

দিদি তুমি আমার কন্‌ফেসর্‌, তা জানো?

: অনেক তো বকেছিস্ পর্ণা, আরো তো হাঁপিয়ে পড়ছিস্ ক্রমাগত—

: না দিদি, আমাকে বাধা দিয়ো না। শোনো, আমি, আমি—আমি একজনকে ভালোবাসতাম্। চমকে উঠোনা, শোনো। তখন আমি সবে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছি—সে আমার চেয়ে তিন ক্লাস উঁচুতে পড়তো।

খুব ভাব হয়েছিল আমাদের দুজনের মধ্যে—দুবচ্ছর ধরে আমরা দুজনে দুজনকে ভালো বেসেছিলাম কিন্তু সে তো ব্রাহ্মণ ছিলো না তাই তার বাবা মাও রাজী হলেন না, আমার বাবা-মাও দিলেন না। ভাগ্যচক্র কেউ হাতে করে ঘুরিয়ে দিতে পারে না দিদি—আই-এ পরীক্ষা দেবার পর আমার এখানে বিয়ে হয়ে গেল।

ঃ দিদি।

ঃ বল্।

ঃ খুব খারাপ লাগছে শুনতে, না? আর একটু ধৈর্য্য ধরো। তাকে আমি গভীরভাবে ভালোবাসতাম—কিশোরী কুমারীর অকলঙ্ক অন্তরের প্রথম রেখা স্বীকার করছি দিদি—কিন্তু তবু তার সঙ্গে আমি পালিয়ে যাইনি, সুবোধ বালিকার মতো এই সম্বন্ধতেই বিয়ে করলাম। আমি ছাড়া মা বাবার আর কেউ নেই—তাঁদের দুঃখ দিতে চাইনি তাই। তাহলে ওঁরা আর আমার মুখ দেখতেন না–নিঃশব্দে নিজেদের মধ্যে তিলে-তিলে পুড়ে মরতেন। তোমরা আমাকে এখন যেমন দুরন্ত আর অত্যাচারী দেখছো এরকমও আমি ছিলাম না আগে—বিয়ের পর হতে আমি এই মুখোস্ পরেছি—তোমাদের আর মা বাবাকে, দুপক্ষকেই বোঝাবার জন্যে যে আমি খুব সুখে আছি—শ্বশুরবাড়ী আমার নিজের ঘরদোর হয়ে গেছে দেখিয়েছি—

আঃ, একটু জল—

কল্যাণী তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে একটু জল দিলে পর্ণার মুখে

ঃ আঃ—হ্যাঁ দিদি কি বলছিলাম। সব জায়গায় ফাঁকি চলে কিন্তু মেয়েদের যিনি দেবতা সেই স্বামীর কাছে ফাঁকি চলে না। আমার মনের গলদ কেমন করে উনি ঠিক ধরে ফেললেন, তাই প্রথম হতেই আমার সংশ্রব এড়িয়ে চলতে লাগলেন—কিন্তু দিদি, এই তোমাকে ছুঁয়ে আমি বলছি, তুমি ওঁকে জানিয়ো, ওঁর প্রতি আমার যে শ্রদ্ধাভক্তি

কোনো ফাঁকি কোনো গলদের স্থান তাতে নেই—দিদি, তুমি আমার এই কথাটি রেখো। ওঁর অসুখের সময়ে আমি প্রতিদিন সূর্য্য উপাসনা করেছি—প্রার্থনা করেছি, ভগবান, নিজের প্রাণশক্তি দিয়ে যেন আমি ওঁকে সুস্থ করে তুলতে পারি—ওঁর সেবার মধ্যে যেন থাকে আমার অক্ষমতার মার্জ্জনা—আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত···আর আমার মনে কোনো গ্লানি নেই দিদি—এখন শুধু তোমার ক্ষমা পেলেই—···

লোকান্তরিতা ছোটো জায়ের আত্মার উদ্দেশ্যে যুক্ত কর সসম্ভ্রমে মাথায় ঠেকালে কল্যাণী।

অধিকরণ

মিষ্ট্রেস্ সুতপা সেন উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন নিজের বিছানায়।

অন্ধকার ঘর। বুকের 'পরে ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে হাত বাড়ালেই আলোর স্থইচ্‌টা হাতে ঠেকে। কিন্তু সে পরিশ্রমটুকু করতেও মনের সায় পাওয়া যাচ্ছে না আপাততঃ।

কতকাল আর এরকম একা—নিতান্তই একার চেষ্টায় আলো জ্বালিয়ে যেতে হবে অন্ধকার ঘরেতে ?

মফঃস্বল স্কুলের টিচার্স কোয়ার্টার্স।

মফঃস্বল হলেও নেহাৎ নগণ্য স্কুল নয়। ছাত্রী সংখ্যা হাজারের কোঠা ডিঙিয়েছে। গভর্ণমেন্ট এডেড্—স্কুল ফাইন্থালে পাশের পার্সেন্টেজ্, স্পোর্টস্, প্রাইজ, স্কলারশিপ, লাইব্রেরী, টিচার ষ্টাফ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে শহরের যে কোনো নাম-করা স্কুলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে! আর স্কুলের এই উন্নতি, এই ছাত্রী সংখ্যার দ্রুত হার বৃদ্ধি যে শুদ্ধ মাত্র অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড মিস্ট্রেস সুতপা সেনের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তা কমিটির মেম্বারেরা ও সেক্রেটারী মুক্ত কণ্ঠে সর্ব্বক্ষণই স্বীকার করেন।

শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে সুতপাদি অত্যন্ত কড়া। সর্ব্বদাই নানান রকম আইন কাহুন সৃষ্টি করছেন, নিজেও অত্যন্ত ডিসিপ্লিন্‌ড। সব সময়ে কাজ ও ভাবনা চিন্তার মধ্যে ডুবে থাক্‌লেও হঠাৎ মাঝে মাঝে কেমন

ফাঁকা লাগে সব কিছু। মনে হয় এত কাজ আর এত বাহবা দিয়েও কেন মনের পৃথিবীর বন্ধুরত্ব ভরাট করা চলে না কিছুটা ?

হেড মিস্ট্রেস্ আপাততঃ মেটারনিটি লিভে আছেন—সুতপা সেনই তাঁর পোষ্ট অফিসিয়েট করছেন। লিভ প্রায়ই নিয়ে থাকেন হেডমিস্ট্রেস মিসেস রমা নিয়োগী—মেটারনিটি লিভই নিয়েছেন ইতিমধ্যে বার তিনেক তাছাড়া সিক্ লিভ্, ক্যাজুয়াল্ লিভ্ ইত্যাদি তো আছেই। তিন চারটি বাচ্ছার মা—স্থূলাঙ্গিনী মহিলা বড়োই আয়েসী—স্কুলের কোনো কিছু কাজই করে উঠতে পারেন না—অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড মিস্ট্রেসই সর্ব্বদা চরকীর মতো ঘোরেন। নেহাৎ মিসেস রমা নিয়োগী বহুদিন আছেন, পারমানেণ্ট পোষ্ট, সেক্রেটারীর নিকটাত্মীয়া, তাই সুতপা সেনের ডেজিগনেশানে আজও অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কথাটা জোড়া আছে। নাহলে কবে উঠে যাওয়ার কথা।

কিন্তু সে কথা সুতপা সেন ভাবছিলেন না এখন। ভাবছিলেন অন্য কথা। তুচ্ছ দুটো ঘটনা ঘটেছে আজ স্কুলে। তার চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো প্রয়োজনীয় বিষয় অপেক্ষা করে রয়েছে মাথা ঘামাবার জন্যে কিন্তু তবু ঘুরে ফিরে ঐ দুটো কথাই মনে আসছিল কেবল।

সেকেণ্ড্ ক্লাসে 'এ' সেকশানের অরুন্ধতী হাজরা গত চার পাঁচ দিন যাবৎ স্কুল কামাই করছে। মেয়েটি বেশ ভালো পড়াশুনায়—তিন সেকশান্ মিলিয়ে প্রায় সত্তর জন মেয়ের মধ্যে ও একা মেকানিক্স্ নিয়েছে। ওর ওপরে অনেক ভরসা রাখেন সুতপা সেন। ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপটা ওকে পাইয়ে দেওয়ার আশায় সুতপা নিজে ওকে মাঝে মাঝে প্রাইভেট্ কোচিং দেন। না বলে কয়ে কামাই করাতে তাই খুব চটেছিলেন তিনি। আজ হঠাৎ লক্ষ্য করলেন অরুন্ধতী এসেছে। দূর থেকে দেখলেন, খুব গল্প করছে ক্লাসের মেয়েদের সাথে হেসে হেসে। শরীর খারাপ হওয়ারও কোনো লক্ষণ দেখলেন না তেমন। মনে মনে

খুব রেগে গিয়ে ওকে আচ্ছা করে ধমকে দেওয়ার জন্যে গটগট করে সুতপা ওদের ক্লাসে ঢুকলেন। রূঢ় স্বরে ডাকলেন "অরুন্ধতী"। মেয়েরা সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠেছিল তাঁকে দেখেই। অপরাধী অরুন্ধতী কুণ্ঠায় মাথা নীচু করে ফেললে। আর তক্ষুনিই সুতপার চোখে পড়ে গেল অরুন্ধতীর ছোট মাথাটিতে ঘন কালো চুলের বিন্যাসের মধ্যে একটা লাল সিঁথি। শাদা সরু সিঁথিটা অদৃশ্য হয়ে পড়েছে। কালো চুলের বেষ্টনীতে সিঁদুরের রঞ্জন যেন বড়ো বেশী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সুতপা দেখলেন তাকিয়ে তাকিয়ে।

অরুন্ধতীকে আর বকা হোলো না—অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ নেওয়া হোলো না, বিমূঢ় ভাবে সুতপা ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানে ভেসে এলো নাইন্ 'এ' সেকশন থেকে চাপা হাসির গুঞ্জন একটা। সুতপাদির বিহ্বল অবস্থা কেউ কখনো দেখেনি তাই অভাবিত ব্যাপারটি সকলে খুব উপভোগ করছে। ফিরে গিয়ে আর ওদের বকা হয়ে উঠলো না।

আর একটী ঘটনাও ছোট্ট। তবে সেটিও আজই ঘটেছে।

ক'ঘণ্টা পরে নানা কাজের চাপে অরুন্ধতী ঘটিত ব্যাপারটি সুতপা সেন ভুলেই গিয়েছিলেন।

ফিফ্‌থ্ পিরিয়ডে স্কুলের বেয়ারা সেদিনের ডাক নিয়ে এলো। নিজের রূমে বসে চিঠিপত্র দেখতে দেখতে ক্লাশ্ এইটের ডলি দত্তের নামে একটা পুরু খাম পেলেন তিনি।

মেয়েদের চিঠিপত্র স্কুলে কচিৎ কালেভদ্রে আসে এক আধখানা। সুতপা সেন প্রত্যেকটি চিঠি নিজে সেন্সর করে তবে মেয়েদের হাতে দেন। এ চিঠিটাও খুললেন তাই. কিন্তু সম্বোধনের বেশী আর কিছু তাঁর চোখে পড়লো না।

সেই পুরোনো চিরকালীন সম্বোধন "প্রিয়তমাসু"।

পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল অবধি বিছুটি বুলিয়ে দিলে সুতপা সেনের ঐ একটিমাত্র মিষ্টি সম্বোধন। এত বড়ো স্পর্দ্ধা কোন্ মেয়ের— তাঁর নাকের তলায় স্কুলে বসেই প্রেমলীলা চালাচ্ছে? চিঠিটা ছুঁড়ে ফেললেন তিনি টেবিলের ওপরে—নীরস কাষ্ঠ নারীর কোমল হাতকে রেয়াৎ করে না—দড়াম করে ঠুকে গেল টেবিলের 'পরে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি কাছে বসেই কাজ করছিলেন। মিস সেনের ভাবান্তর লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন: কি হোলো?

: কি আবার হবে? আমার মাথা হয়েছে—আপনার কচি কচি মেয়েদের কীর্ত্তি দেখুন।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি চিঠিটা একবার নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে দেখলেন। তারপর বললেন: তাইতো!

: তাইতো! শুধু ঐ কথায় সেরে দেবেন? আমার স্কুলে এ সমস্ত ব্যাপার আমি ঘটতে দেবো না মিসেস চ্যাটার্জ্জি—আপনি যাই বলুন! কি সব হয়ে উঠেছে আজকালকার মেয়েরা, অ্যাঁ? আমরাও তো একদিন স্কুলের ছাত্রী ছিলুম, এ সব কখনো স্বপ্নে কল্পনা করতে পেরেছি? করা তো দূরের কথা বলুন না? শুধু এই একটা চিঠি? সেদিন জানেন— সুরমাদি আসেননি তা আমি 'টেনে'তে সুরমাদির লেটার-রাইটিং ক্লাশ নিচ্ছিলাম। ক্লাশে একটা লেটার লিখতে দিয়েছিলাম, তারপর খাতাগুলো কালেক্ট করে কোয়ার্টার্সে নিয়ে গেলুম দেখবার জন্যে। বসে বসে দেখছি —ওমা বলবো কি আপনাকে মিসেস চ্যাটার্জ্জি—কল্যাণী রায়ের খাতার আগের কখানা লেটার উল্টোতে উল্টোতে দেখি কিনা একখানা চিঠি লেখা রয়েছে বাংলাতে। পড়লুম্। ন্যাকা ন্যাকা প্রেমপত্র একখানা। কি স্পর্দ্ধা বুঝুন্—দিদিদের দেখতে দেবে যে খাতা সেই খাতাতেই লিখে রেখেছে? সুরমাদি নিশ্চয়ই ও চিঠিটা লিখতে দেননি? লেটারের খাতাতে প্রেমপত্র মকশো করেছেন বসে বসে গুণবতী। দরকার হলে

সেক্রেটারীকে বলে রাষ্টিকেট্ করে দেবো আমি এই সব মেয়েদের—আর পাঁচটা মেয়ে খারাপ হবার সুযোগ যাতে না পায়। অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলতে পারে না। এটা আর কিছু নাচ গানের স্কুল নয়!

: সে তো নিশ্চয়ই। একশোবার সত্যি সে কথা। তবে এটা বোধ হয় তেমন অনাচার নয়।

: কোনটা? এই চিঠিটা? তার মানে? উত্তেজনার আতিশয্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সুতপা সেন। অবরুদ্ধ ক্রোধের চাপে মুখ লালচে হয়ে উঠলো প্রায়।

: আর আপনার কাছে কি অনাচার হবে মিসেস চ্যাটার্জ্জি? একটা কুমারী মেয়েকে একটা পুরুষ প্রিয়তমা বলছে সেটা খুব সদাচার! না? প্রিয়তমা, প্রেম এসব কথা বানান করবার মতো জ্ঞান বুদ্ধি বা বয়স হয়েছে মেয়েটার? ঐ ডলি দত্তের?

: শিখে নেওয়া উচিৎ। স্বামীর যখন অত সোহাগ করে চিঠি লেখবার শখ—

: স্বামী?? মানে?

: ডলির তো বিয়ে হয়ে গেছে মাস ছয়েক হোলো।

সুতপা সেন খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মিসেস চ্যাটার্জ্জির মুখের দিকে।

: কি করে জানলেন আপনি? তা ছাড়া এটা ওর স্বামীর চিঠি তাই বা কে বললে?

: ডলির আমি প্রাইভেট টিউট্রেস। ওর স্বামী এতদিন এখানেই ছিলো, সম্প্রতি কোলকাতায় বদলী হয়ে গেছে। খামটা দেখলাম যে! অফিসের খাম—ল্যাণ্ড্ অ্যাকুইজিসন, ওর স্বামী ওখানেই কাজ করে।

অপ্রস্তুত ভাবটাকে চাপা দেবার জন্যে সুতপা সেন আবার হঠাৎ চটে উঠলেন।

ঃ তা হোক—স্বামীই লিখুক আর যেই লিখুক ইস্কুলটা আর কিছু লাভ লেটার ডেসপ্যাচ অফিস নয়। এ চিঠি ওকে দেওয়া হবে না। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে হচ্ছে কি মেয়েগুলো, অকালপক্ক হয়ে পড়ছে। আমার হাতে থাকলে এসব বন্ধ করে দিতুম। অদ্ভুত!

যখন শ্বশুরঘর করতে যাবে তখন ওসব করবে, এখন পড়াশুনা করছে তাই করুক্।

ঃ বেশ তো! মুখে সায় দিয়েছিলেন বটে মিসেস চ্যাটার্জ্জি কিন্তু মুচকি হেসেওছিলেন সেই সঙ্গে। সুতপা সেনের চোখ এড়ায়নি সেটা।

এখন নিজের ঘরে অন্ধকারে একা বিছানায় শুয়ে এ ঘটনাটাও বড়ো বেশী স্পষ্ট আকার ধারণ করে ফুটে উঠছে।

মনে হচ্ছে নাইন্ 'এ' সেকশানের মেয়েদের চাপা হাসির সঙ্গে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির মুচকি হাসির কোথায় যেন মিল আছে। ও দুটোই একজাতীয়।

ডলি দত্তের স্বামীর চিঠিটা ওকে দেননি সুতপা কিন্তু ফেলতেও পারেননি সেটা। রাখা আছে ব্যাগে। অন্যায় হোলো কি ওর জিনিষ থেকে ওকে বঞ্চিত করে?

আশ্চর্য্য সমাজ আর আশ্চর্য্যতর তার আইন। ডলি দত্তের সিঁথি যদি অরুন্ধতীর মতো লাল না হতো তাহলে এই ব্যাপারটাই কতদূর নিন্দনীয়, ঘৃণার্হ হতো! কিন্তু এখন ডলি সগর্ব্বে সর্ব্বসমক্ষে ও চিঠিটা দাবী করতে পারে। সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ওকে উদ্দেশ করেই ও চিঠিটা লেখা হয়েছে—ওরই প্রাপ্য ওটা।

প্রেম করা যে মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এটা সুতপা সেন অস্বীকার করেন না, প্রেমের প্রতি তাঁর ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা আছে কোনো

কারণে প্রচণ্ডরকম এ ধারণা করাও ভুল। আসলে স্থতপা সেনের বিশ্বাস—ও জিনিষটা যৌবনেরই একান্ত নিজস্ব। সবেমাত্র কৈশোরের দ্বারে উত্তীর্ণা হয়েছে যে মেয়েরা, যারা এখনো বালিকা পদবাচ্যা তারা কি বুঝবে প্রেমের মর্ম্ম ?

কিন্তু এক হিসেবে বোধহয় ওরাই ভালো আছে।

অন্ধকারে স্থতপা সেনের নিঃশ্বাস পড়লো একটা। কত ছোটো বয়সে ফস্ ফস্ করে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে—পাঁচদিন স্কুল কামাই করে একদিন সিঁদুর রঞ্জিত সিঁথি আর শাঁখা শোভিত হাত নিয়ে এসে হাজির হচ্ছে। রুচি গড়বার স্থযোগ পেল না, ভাবনাচিন্তার অবকাশ এলো না —কত সহজে জীবনের একটা প্রধান—হয়তো বা সর্বপ্রধান সমস্যাই মিটে গেল ঘটকালি সেতুর সহযোগিতায় !

এইই ভালো। চিন্তা আর সমস্যার আবর্ত্তে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে তাঁর একটা পুরো জীবন কেটে যেতে চললো তবু বিয়েসম্পর্কিত জটিলতা ঘুচলো না তো !

কত বয়স হোলো ? হিসেবও থাকে না আর ! এই স্কুলেই তো কাজ করছেন তা···ন বছর হয়ে গেল। তার আগে কোলকাতার স্কুলটাতে করেছেন বছর দুয়েক। বি. এ পাশ করেই কাজে ঢুকেছিলেন —এখানে পারমানেন্ট্ হবার পরে তো ডেপুটেশনে বি. টি. পাশ করে ডোমেষ্টিক সায়েন্স ট্রেণিং কম্প্লিট্ করে নিয়ে এসেছেন।

বি. এ. পাশ্ করেছেন কত—হ্যাঁ, উনিশ বছর বয়সেই তো। তাহলে এখন বয়স দাঁড়াচ্ছে একত্রিশ বছর। একত্রিশও পেরিয়ে গেছে। প্রচুর বয়স – আর যাই হোক এই বয়সে লাল চেলী পরে আর লোকের হাসির খোরাক জোগানো চলে না। তাঁর প্রাক্তন কয়েকটি ছাত্রীর মেয়েরা অবধি তাঁর বর্ত্তমান ছাত্রী হয়ে গেছে যখন !

আচ্ছা, ঠিক এখন কতগুলি বিবাহিতা ছাত্রী ওঁর ? ভ্রূ কুঁচকে

স্থতপা সেন মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। এর আগে তো কখনো হিসাব করবার কথা মনে আসেনি! 'টেনে' আছে দুটি— 'নাইনে' একটাও ছিলো না, এখন থেকে হোলো একটি—'এইটেও ক' সেক্‌শন মিলিয়ে ডলি ছাড়া আরো তিনজন আছে। 'এইটে'ই সব থেকে বেশী সারা স্কুলের মধ্যে। কেন? ঐ বয়সটাই কি প্রামাণ্য? উদ্বাহের শুভযোগী ষ্ট্যাণ্ডার্ড?

সবচেয়ে নীচে কোন ক্লাসে আছে? আছে—হ্যাঁ, ক্লাস ফাইভে একটি বিবাহিতা মেয়ে আছে বোধহয় 'সি' সেকশনে—নামটা জানেন না স্থতপা। মেয়েটা ফ্রক পরতো, বিয়ের পর হতে কোনোরকমে শাড়ী জড়িয়ে আসে একটা করে। কী আশ্চর্য্য! তাঁরই ছাত্রীরা, পড়া না পারলে যাদের কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন না, যাদের জ্ঞানের স্বল্পতা নিয়ে তিনি সর্ব্বদা হা হুতাশ করছেন তারা অন্ততঃ একটা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে গেছে।

ওদের স্কুলেতে শাসন শৃঙ্খলার কড়া নিগড়ে বেঁধে রাখতে পারেন তিনি—হোমষ্টাডির জন্য 'ডেলি রুটিন্' তৈরী করে দিতে পারেন— স্নান করা, বই পড়া, খাওয়া, বেড়ানো বাইরের বই কি কি পড়বে তার তালিকা করে দেওয়া সমস্ত করে দিতে পারেন নিশ্ছিদ্র কর্ম্ম-তালিকার বন্ধনীতে···সর্ব্ব বিষয়ে সতর্ক কড়া পাহারা দিতে পারেন— পারেন না কেবল একটিমাত্র বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা করতে। শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধীয় ষ্টাডি, বরের সঙ্গে কতটা নিষিদ্ধ আলাপ করবে তার সীমা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়—হলেনই বা বড়দিদিমণি, অনভিজ্ঞা সুতপা সেন আর তাঁর উপদেশসমূহ একেবারে অচল ঐ একটি ক্ষেত্রে।

ওদের অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রম করে চলা উচিত তাঁর পক্ষে কারণ তাঁর চেয়ে একটা পাঠ ওরা বেশী পড়ে ফেলেছে।

পড়ে ফেলেছেই বা কি করে বলা যায়? হয়তো পারছেই না পড়তে, বুঝছে না কিছু, পদে পদে ভুল করছে, হোঁচট খাচ্ছে ক্রমাগত। জীবনের এত বড়ো গুরুতর প্রয়োজনীয় দিক এত সহজেই অবলীলাক্রমে মুখস্থ করে ফেলতে পারবে ওরা? মা বাপের প্রাণান্ত পরিশ্রমে যোগাড় করা কোনো এক বিয়ের লগ্নে, তাঁদেরই তাড়নার ফলে পড়ার বই ফেলে কচি বয়সে একবার গিয়ে পিঁড়িতে বসেছে যেহেতু?

দু লাইন বইয়ের পড়া যারা মুখস্থ করে আসতে পারে না কোনোমতে?

অরুন্ধতী এই স্কুলে ছোট্টোটি থেকে পড়ছে। ন বছর আগে একটি বছর পাঁচ ছ'য়ের বাচ্চা মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাবার হাত ধরে এসে ক্লাস্ ওয়ানে ভর্ত্তি হয়েছিল। ছোট্টো ফুটফুটে মেয়েটি স্কুলে সব সময়ে তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকতো। তখন সবে স্কুলে এসেছেন তিনি, এত কড়া হয়ে ওঠেন নি। অন্য কোনো দিদিকে দেখলে মেয়েটি ভয়ে কাঁদতে শুরু করে দিত। অরুন্ধতীকে একেবারে হাতে করে গড়ে তুলেছেন তিনি বলতে গেলে।

আশ্চর্য্য! সেই অরুন্ধতীর আজ বিয়ে হয়ে গেল। কবে হয়তো অরুন্ধতীরই ছোটো সংস্করণ একটি ফুটফুটে মেয়ের হাত ধরে অরুন্ধতী তাঁর কাছে এসে দাঁড়াবে, আবার সলজ্জ ভাবে ভর্ত্তি করে নেওয়ার আবেদন জানাবে। কিছুই আর আশ্চর্য্য নয় পৃথিবীতে।

নিজের ছোটো বোন, বোনঝি, ভাইঝি কিছুই নেই—বয়সের বর্দ্ধিষ্ণু পরিবর্ত্তনটা তাই চট করে তাঁর চোখে পড়ে না।

ছোটো ছোটো ছাত্রীদের বড়ো হয়ে যেতে দেখে তাই বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে থাকেন সুতপা সেন—ঘটনাটা যে 'সহসা' নয় এ বোধটা বড়ো দেরীতে জাগে।

পাশ ফিরে শুতে গিয়েই ডান হাতটা বালিশের কাছে রাখা ব্যাগের

ওপরে গিয়ে পড়লো। ব্যাগের স্পর্শটা যেন অন্য একটা কথা মনে পড়িয়ে দিলো। এই ব্যাগের গর্ভেই রাখা আছে তাঁর ছাত্রী—কন্যাসমা শিষ্যা ডলির স্বামীর চিঠি। টাটকা প্রেমপত্র একখানা।

বিছানায় উঠে বসে নিঃশব্দে আলোটা জ্বাললেন সুতপা। বিস্রস্ত শাড়ীটা হাত দিয়ে ভালো করে গুছিয়ে নিলেন, তারপর খাট হতে নেমে সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

এত সতর্কতার প্রয়োজন ছিলো না—এই কোয়াটার্সটিতে তাঁরা সাতজন টিচার আছেন যদিও সবশুদ্ধ তবু সারা দোতলাটা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। বাথ রুম, রান্নাঘর আর বড়ো শোবার ঘর একটি। একতলায় চারখানা ঘরে আর ছজন টিচার থাকেন বটে তবে তাঁদের কখনো ওপরে আসবার দরকার হয় না আর বিনা দরকারে এমনিও তাঁরা কখনো আসেন না। সুতপা সেনকে সকলেই যথেষ্ট সমীহ করে চলেন।

তবু সুতপা সেনের বুক টিপটিপ করতে লাগলো। ঝিটা দালানে পড়ে ঘুমোচ্ছে। সুতপা পা টিপে টিপে বিছানায় ফিরে গেলেন আস্তে আস্তে চিঠিটা ব্যাগ থেকে বার করে ভাঁজ খুললেন।

কিন্তু আবার সেই 'প্রিয়তমাসু' সম্বোধনের বেশী আর তিনি পড়তে পারলেন না। সারা মন বিদ্রোহ করে উঠলো। কেন এরকম হবে? কুমারী মেয়ের চিঠি হলে পড়তেন, অত্যন্ত চটে ও যেতেন কিন্তু এ আইন সম্মত সমাজ অনুমোদিত ব্যাপার বলেই পড়তেও পাচ্ছেন না, চটে ওঠাও হচ্ছে না।

কেন নিজের ছাত্রীর চিঠি এরকম ভাবে সকলের চোখের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে পড়তে হবে তাঁকে লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে? কেন তাঁর নিজের একখানা এরকম চিঠি আসবে না যা সকলের সামনেই গর্ব্বভরে নিজস্ব বলে দাবী করতে পারবেন তিনি?

নিজের দেহের পা থেকে মাথা অবধি একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলেন

সুতপা। এমনই কি বয়স বেশী হয়ে গেছে ? এককালীন রূপের রেশ সর্বাঙ্গে এখনো আলতো ভাবে আটকে রয়েছে—সপ্রেম কোমলতার পরশ দিয়ে ছোঁয়া যায় তাকে, পড়ন্ত যৌবনকে বেঁধে রাখা চলে। এখনো ঝানু পোক্ত, নীরস প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সুলভ শুষ্কং কাষ্ঠং চেহারা তাঁর হয়ে ওঠেনি, সেরকম ছাপমারা আকৃতি বাগাতে আরো বছর চারেক লাগবে তাঁর পক্ষে বোধ হয়।

ভাগ্যিস ! সুতপা শিউরে উঠলেন। এখনো সময় আছে বড়ো স্থিরমতি—এখনো বয়ে যাওয়া লগ্নকে একাগ্র চেষ্টার সহায়তায় ভাসিয়ে ভাসিয়ে এনে আটক করা চলে। তা না হলে কি হতো !

ও তো বলেই ছিলো, 'তোমার সবরকম খেয়ালের প্রশ্রয় দিচ্ছি—দেবোও—যা খুসী করোগে যাও বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হয়ে থেকে, কিন্তু দোহাই তোমার টিপিক্যাল্ মাষ্টারনী ব'নে যাবার আগে আমাকে একটা খবর দিও অন্ততঃ। কিংবা নিজেই খবর নেবো, স্বার্থ আছে যখন আমার, বেতের তৈরী মানুষ নিয়ে সারাজীবন ঘর করা অন্ততঃ চিন্ময় রায়ের পোষাবে না।'

সে খবর নেওয়ার ক্ষণ কি এখনো এসে পৌছলো না ?

আচ্ছা, ও কি এখনো অপেক্ষা করে আছে ? কোথায় পাওয়া যাবে এ প্রশ্নের উত্তর ? সুতপা সেন হেসে উঠেছিলেন খিল্ খিল্ করে একদিন —তাঁর বিচারে এক অসঙ্গত প্রস্তাবের উত্তরে।

: কি ভাবো তুমি ! ক্লাসমেট্,—বয়সে এক, বিদ্যায় এক, মনন শক্তি, চিন্তা ধ্যানধারণা সবেতে সমান, তোমাকে শ্রদ্ধা করবার মতো কোনো ফাঁক রেখেছো নাকি কোথাও ? আর শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের ভিত্তিতে যদি উঁচু নাই হয়ে উঠতে পারলে তো সমতার বনেদে গড়া তোমার প্রস্তাবিত সম্পর্ক যে ধ্বসে পড়ে ধূলো হয়ে গুঁড়িয়ে একশা হয়ে যাবে একেবারে ভালো মশলার অভাবে, ভেবে দেখেছো সেটা ? যাও, যাও—নিজেকে

আগে ভালো করে তৈরী করো' গে। অভিভাবক হতে পারার মতো গাম্ভীর্য্য গুরুত্ব আনো আগে স্বভাবে, তারপর বিয়ে করতে এসো। বৌ সামলাবে কি করে না হলে ?

আজ যদি সেদিনের সেই হাসিভরা মন্তব্যের পাল্টা শোধ তোলে চিন্ময় শুধু হাসি দিয়েই ? তবু······হাতের মুঠোর মধ্যে নীলাভ সুগন্ধি কাগজখানা একবার মুচড়ে ধরলেন সুতপা তারপর কুটি কুটি করে ছিঁড়ে জানলা দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলেন।

মনস্থির করতে খানিকটা সময় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তিনি তারপর উঠে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন টেবিলের দিকে। টেবিলল্যাম্প জ্বেলে ড্রয়ার থেকে লেটার প্যাড্ বার করলেন সুতপা, বসলেন চেয়ারে জুৎ করে।

হাতের কলমটা এঁকে বেঁকে কতকগুলো নিটোল নীলা সাজিয়ে যেতে লাগলো ব্লু-ব্ল্যাক কালি দিয়ে নীলাভ আর ক'খানা কাগজের 'পরে।

বাসর ঘরে ভিড়টা সরে যেতেই চিন্ময় হো হো করে হেসে উঠলো। যেন তার হাসির ঝরণার প্রচণ্ড তোড় শুধু এই ভিড়ের বাঁধেই আটকে ছিলো এতক্ষণ।

সুতপা ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। ঠিক একেবারে আগেকার মতো সেই ফাজিল ছোকরাটি আছে—একটুও পরিবর্ত্তন হয়নি, গাম্ভীর্য্যের উন্নতি আসেনি সময়ের ব্যবধানে।

: অমন করে তাকাচ্ছো যে ? খেয়ে ফেলবে নাকি ? ভয় হচ্ছে কান ধরে হয়তো এক্ষুণি দাঁড় করিয়ে দেবে।

: দেওয়াই উচিত। অভদ্রের মতো অত হাসছো কেন ?

: অত হাসবো না'তো কি আধুনিক ভদ্রলোকেদের মতো ফিস

ফিস্ করে ঢোলা পাঞ্জাবীর আস্তিনে মুখ লুকিয়ে ছটাকখানেক হাসবো? সে আমার আসে না।

: হঠাৎ এত হাসি পেল কেন তোমার শুনি? আমাকে দেখে নাকি?

: তোমাকে দেখেই তো পাওয়া উচিত। ভাবছি তোমার ছাত্রীদের দুরবস্থার কথা। শেষে কিনা বেচারাদের বড়দিদিমণিকে সাজাতে হোলো চেলী চন্দন দিয়ে? ওহোঃ কি ট্র্যাজেডি! ছাত্রীদের পক্ষে ট্র্যাজেডি, তাদের বড়দিদিমণির পক্ষে ট্র্যাজেডি, যারা এ বিধুর, মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যের দর্শক তাদের পক্ষে ট্র্যাজেডি, যারা অংশ গ্রহণ করছে তাদের পক্ষে ট্র্যাজেডি আর সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি হচ্ছে বড়-দিদিমণির অতি হতভাগ্য একেবারে ফ্রেশ্ মানে বিশুদ্ধ স্বামীটির, —ছাত্রীদের বড়োজামাইবাবুটির।

: এত ট্র্যাজিক্ সিন্ করলে কেন? মত না দিলেই পারতে? আমার ছাত্রীদের দেখে বড্ডো লোভ লাগছে বুঝি? কচি ডাবের শাঁসই মিষ্টি লাগে খেতে।

: ঝুনো নারকোলই বা কম যায় কিসে, সেটাও খেতে আমার মন্দ লাগে না, সত্যি বলছি। না বাবা, প্যান্‌পেনে কচি খুকী একটি কুড়িয়ে এনে লালন পালন করে মানুষ করা আমার পোষাবে না। ওঃ প্রভাত একটি ছিঁচকাঁদুনী নিয়ে যা হিমসিম্ খাচ্ছে—

: প্রভাত আবার কে?

: প্রভাত আমার বন্ধু। অবিশ্যি বছর দেড়েকের ছোটো আমার চেয়ে। দেখেছো বোধহয় ওকে একবার আমার সঙ্গে। দেখোনি? আই-এ পাশ করেছিলাম একসঙ্গে, তারপরে ও ভালো কাজ পেয়ে ল্যাণ্ড্ অ্যাকুইজিসনে চলে গেল—সম্প্রতি বিয়ে করেছে।

: বন্ধু সত্যিকারেরই বলো তাহলে! মিল সবেতেই—নিষ্মার্গ গমন

পথের কাল নির্দ্ধারণেও এত অভেদাত্মা যে ওর বিয়ে দেখেই ফস্ করে তুমিও দগ্ধ অন্তরে সম্মতি দিয়ে বসলে।

: বলতে পারো। মিল সত্যিই খুব আমাদের দুজনের মধ্যে, বন্ধুত্বও যথেষ্ট—এত গলায় গলায় ভাব যে একটি বৌ নিয়ে ভাগাভাগি করেই আমাদের কাজ চলে যায়—খরচ বাড়বার ভয়ে এতদিন দুটি বৌ করতে রাজী হইনি।

: মানে? সুতপা যেন হঠাৎ প্রচণ্ড রকমের শক্ খেলেন একটা।

: মানে খুবই প্রাঞ্জল। তুমি কি এখনো কিছুই বুঝতে পারনি?

: কি বুঝবো আমি? কঠিন চোখে সুতপা তাকালেন।

: মনে রেখো তোমার গত এগারো বছরের জীবনযাত্রা, গতিবিধি, কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমি একেবারে কিছুই জানি না।

: সেটা তো উভয়তঃই। তুমি কি করে বেড়িয়েছ ঐ এগারো বছর যাবৎ তাও তো আমার জ্ঞানের গণ্ডীতে পড়ে না শ্রীমতী?

: জানতে পারা খুব সহজ। একটু চেষ্টা এবং ইচ্ছে করলেই গার্লস্ স্কুলের অফিসিয়েটিং হেডমিষ্ট্রেসের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আর তাঁর রীতি নীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারো। একটুও এদিক ওদিক করলে আর অন্ততঃ মিষ্ট্রেসদের পক্ষে ভালো রেকর্ড রাখতে পারা সম্ভব হয় না আমার আবার বিশেষ করে ক্যারেক্টার রিপোর্ট অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

: বলো কী? তবে আমাদের দেশেই একটা কথা আছে না ডুবে ডুবে জল খেলে—ইত্যাদি? তার ওপর জ্ঞান বুদ্ধি তোমার কম নয় —সময়ে বিয়ে হলে আজ আমার বয়সী তোমার জামাই আসতো।

: বেশ হতো! বিয়ে যখন হয়েই গেছে আর ফিরিয়ে নিতে পারা যাবে না তখন আফশোষ করে আর লাভ কি! বুড়ী যে হয়ে

গিয়েছি সে তো আমি অস্বীকার করছি না, নিজের কোনো কিছু আমি অন্ততঃ গোপন করিনি মোটেই তোমার কাছে।

: সে কথা হচ্ছেনা। বলছিলাম যে যদি এত উৎকট রকমের সৎচরিত্রা না হয়ে একটু আধটু ভেজালের খাদ মিশতো তোমার খাঁটিত্বে, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতাম। একেবারে 'র মেটিরিয়াল'—খনি থেকে তোলা জিনিষ নিয়ে কি আর ব্যবহার করা চলে? বনে বসে তপস্যা করেছো আর নিরুপদ্রবে নির্ভাবনায় একটি আদর্শা শিক্ষয়িত্রী তৈরী হবার সুযোগ পেয়েছ! স্বীকার করছি—ছুটকো ছাট্‌কা এই এদিক সেদিকে একটু আধটু ছিঁচকেপনা করেছি কিন্তু তা বলে নিজেরি শিষ্যার বরের চিঠি দেখে হিংসেয় জলেপুড়ে অস্থির হয়ে যাওয়ার মতো পাপ কাজ করিনি এটা সত্যি কথা—

: কি বললে—?

: কি আর বললাম এমন? চিন্ময় উদাসীনভাবে বাইরের দিকে তাকালো। : বললাম্ যে—ডলি দত্তের বরের চিঠি দেখে মনের জ্বালায় খাক্ হয়ে গিয়ে পড়্ পড়্ করে একজনকে পায়ে ধরে সেধে এনে বিয়ে করতে পথ না পাওয়ার মতো মতিচ্ছন্ন অন্ততঃ আমার ধরেনি এই কথাই বললাম আর কী মিষ্টি করে গুছিয়ে গুছিয়ে।

: তার মানে?? তুমি কি করে জানলে ও কথা?

সুতপার মূর্ত্তি দেখে চিন্ময় আরেক দফা হো-হো করে হেসে ঘর ফাটিয়ে ফেললে।

: বেশ দেখাচ্ছে এখন। গোপন কথাটি জেনে ফেলেছি তো? নাও এখন কৌতূহল নিয়ে ভোগো।—আরে বোকা, আমি তোমাকে বলেছিলাম না সেই আগে, যে আমার স্বার্থ রইলো যখন আমি খোঁজ নেবো তুমি মাষ্টারণী হয়ে যাচ্ছো কিনা? দশ বছর হয়ে গেল দেখে কায়দা করে তো সেই খবরটাই নিলাম। তোমার ঐ ডলির সঙ্গেই

প্রভাতের বিয়ে হয়েছে যে। বিয়ের পর ডলি খালি ইস্কুলের বন্ধুদের কথা, তোমাদের কথা, আলুকাবলি খাওয়ার কথা এই সব গল্পই করতো। ছেলেমানুষ তো—আর কিছু শেখেনি এখনো বেচারী। ডলির মুখে যখন তোমার গল্প শুনলাম্ এত মন খারাপ হয়ে গেল—হায় হায় প্রভাত আর আমি অভিন্নহৃদয় বন্ধু—প্রভাতের ভাগ্যে কিনা এই নবীনা আর আমার কপালে তারই প্রবীণা গুরুনী ? যাকগে ললাট লিপি তো আর মানুষ উল্টে দিতে পারে না, ভবিতব্যই মেনে নিতে সচেষ্ট হলুম। ডলির কাছে তোমার সমস্ত গল্প শুনতাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে—অবিশ্যি ওদের জানতে দিইনি কিছু, মানে জানাতে লজ্জা করেছিল আর কি অত বয়সের পার্থক্যটা ! বিয়ে তো বেশি দিন হয়নি, প্রভাত এখানেই ছিল কিছুদিন। চিঠি লেখার দরকার হয়নি ডলি তাই ওর হাতের লেখা চেনে না। শুনেছিলাম তুমি স্কুলে বসে প্রত্যেকটি চিঠি সেন্সর করো। তাই ডলি যখন এখানে চলে এলো—দিলাম প্রভাতের জবানীতে একখানা মারাত্মক চিঠি ঝেড়ে। আর হেসে কুটি কুটি হতে থাকলাম এই ভেবে যে আমার হাতের অপরাকে লেখা প্রেমপত্র দেখে তুমি কতখানি ছটফটিয়ে মরছো !

: কিন্তু তোমার ও চিঠিটা তো আমি পড়িই নি মোটে। শুধু সম্বোধনটা দেখেছিলাম। তোমার হাতের লেখা বলে চিনতেই পারি নি।

: ওরে বাব্ব্বাঃ—শুধু এইতেই এত, সম্বোধনে শক্তিশেল ? লেখা চিনতে পারলে না জানি তাহলে কোন্ গন্ধমাদন স্থানচ্যুত হতো ! সাধে কি আর শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন—স্ত্রীলোক জাতিটা সাংঘাতিক !

: আর পুরুষ জাতিটাই একেবারে মেনিমুখো বেড়াল ছানা কিনা ! আচ্ছা কি হতো, যদি আমি ডলির স্বামীর চিঠি হিসেবে ওকে দিয়ে দিতুম ?

: আহা মধু মধু! কি বাক্যামৃতই পান করালে সখী, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হচ্ছে, শিহরণ জাগছে! প্রাণ ধরে কি আর দিতে পারতে বাছা? ডলি প্রভাতের হস্তাক্ষর চেনে না। আহা, তেমন মধুর কপাল কি আর আমার মতো হতভাগার?

: থামো! খুব হয়েছে। আর মাধুর্য্য রস বিতরণ করতে হবে না। বাবা পেটে পেটে এতও আসে।

: এতর কি দেখলে শুনি? সবে তো একটি নমুনা পেয়েছো— এখনো সারা জীবন উপভোগ করতে বাকী।

কিন্তু সার্থক সুক্ষণে তোমার নাম রাখা হয়েছিল সুতপা—যাই বলো একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। উঃ—অর্দ্ধেকের ওপর জীবন ধরে কি কঠোর একাগ্র তপস্যাই না সেই জ্যোতির্ম্ময় কনক চিন্ময় মূর্ত্তি লাভের মানসে। তা সফল হয়েছে শেষে—যাক্। চিন্ময় মূর্ত্তি ভক্তের নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তাকে ধন্য করতে আবির্ভূত হলেন। হয়ে এখন এখানে বসে আছেন তাকিয়া ঠেসান দিয়ে।

: বয়ে গেছে আমার তোমার জন্যে তপস্যা করতে!

: পথে এসো! তবে অপর কারুর জন্যে করছিলে। আর আমি যদি একটু পরস্ত্রী ফরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করি তো স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যাবে একেবারে। আচ্ছা আমি ভাবছি তুমি আবার কোন মুখে এই অবস্থায় এই সাজে ডলির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। তোমাকে কিন্তু আমি বারবার করে অনুরোধ করেছিলাম টিচারী কোরো না—ওতে আমার বড়ো ভয়। তুমি কিছুতেই শুনলে না—আমার কথাটা রাখলে না। যাই হোক যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। এখন কবে রেজিগ্‌নেশন্ দিচ্ছ, বলো?

: দেবো, শিগ্‌গিরই দেবো, তোমার যখন এত অমত। কেবল শুধু···

: শুধু কী?

সুতপা চিন্ময়ের কাঁধের পরে মাথা নোয়ালেন। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন: শুধু ইস্কুলের ঠিকানায় আমার নামে খান দু'তিন চিঠি তুমি ওখান থেকে লিখবে, বলো? তাহলে আমি—

চিন্ময়ের দরাজ হাসির প্রাবল্য সুতপার বাকী ক্ষীণ কথাটুকু কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

জয়জয়ন্তী

রোদ হেলে পড়েছে।

গৈলানের মাঠ টা টা করেছে সারাদিন। এখন কেমন ক্লান্ত অবসন্ন দেখাচ্ছে অত বড়ো ডাঙাটাকে। গুলাব্ কুমকুম্ আর রক্তচন্দন মিশিয়ে গুঁড়ো করে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে গৈলানের মাঠের পশ্চিম দিগন্ত ভরে—অস্ত যাচ্ছে রাঙা রবি।

দ্রুতপায়ে মাঠের আল ভাঙছিল সরফুন্নেসা। বেলা গেছে! চাচীর বাড়িতে আজ সকাল সকাল পৌঁছবার কথা তার। দাওয়াত্ আছে। সরফুন্নেসার হাতের রান্না খাওয়াবে মেহ্মানদের—চাচী বলে দিয়েছে অনেক করে। সরফুন্নেসা তাই একটু তাড়াতাড়িই করছে। উনিশ বছরের তরুণীর টলটলে মুখটি পরিশ্রমে রাঙা হয়ে উঠেছে—চিকণ দেহ বেয়ে ঝরছে স্বেদকণা শাদা মুক্তোর মতো।

মাঠের ওপারে দরগা। বিষণ্ণ মেদুর অপরাহ্ণের ছায়া পড়েছে সবখানে—ওপাশের নিঃসীম আকাশে শব্দহীন ভাস্বরতা অব্যক্ত বেদনার আকুতিতে উচ্ছ্বসিত। সরফুন্নেসা চলেছে।

মসজিদের কাছে এসে থমকে পড়ল সরফুন্নেসা। কেমন একটু গা ছমছমাচ্ছে যেন, জনপ্রাণী নেই আশেপাশে কোথাও। দিগ্‌ভ্রষ্ট একটা চিল কেবল অসহায়ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ওপরে। ডাগর শঙ্কিত দুই চোখে চারিদিকে একবার তাকাল সরফুন্নেসা—

অকারণেই গায়ের জাফরাণী ওড়নাটা টেনে দিলে একবার। নাঃ, ভয়ের কি আছে—মসজিদের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরলে সে। আল্লার দোয়াব রয়েছে না এখানে? তা ছাড়া আল্লা থাকেন না কোথায়?

কিন্তু ওকি? ভাঙা মিনারটা আরো বড়ো হয়েছে মনে হচ্ছে যেন? বোধ হয় সরফুন্নেসার চোখের ভুল। সুন্দর দীর্ঘশীর্ষ দুটি মিনার মসজিদের দুপাশে ছিল, মাথাতে ঝলমলে পঙ্কের কাজ করা। গত বোশেখের ঝড়ে এদিকের মিনারটা একেবারে শুয়ে পড়েছিল মাটির ওপরে। ভাগ্যে কেউ চাপা পড়েনি ওর তলায়। তার ক'মাস পরে গাঁয়ের লোকেদের কথায় গণি মিঞা রাজী হয়েছিল মিনার গড়ে দিতে। চমৎকার হাতের কাজ গণি মিঞার—এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কারিগর। সুন্দর করে পুরোপুরি প্রথমটার সঙ্গে মিলিয়ে নতুনটা গড়তে আরম্ভ করলে ঠিক আগেকার জায়গায়। কিন্তু আধখান সবে গড়া হয়েছে, কাটান্ দেবার আগেই হোসেনগঞ্জের নবাব বাড়িতে বায়না পেয়ে মোটা মজুরীর আশায় বে'রোজের মিনার গড়ার কাজ ছেড়ে দিয়ে গণি মিঞা চলে গেল। মসজিদের কাজ শেষ করলে না—ওর গুণাহের কি শেষ হবে? কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আরো উঁচু হয়েছে একটু। কাটান্ দেবার আগেই তো গণি চলে গিয়েছিল—কিন্তু এখন ওলনে কাটান্ পড়েছে যেন একটা। অবহেলিত অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া নতুন মিনারটাকে এর আগেও তো দেখেছে সরফুন্নেসা—পিপুলের চারার মেয়াতের নিচুই ছিল। কিন্তু পিপুলের চারার মাথা ছাড়িয়েছে না এখন? নাকি ঠিক ঠাহর পাচ্ছে না সরফুন্নেসা—উনিশ বছর বয়সেই চোখে চাল্‌সে ধরলো তার!

ফেরবার সময়ে সরফুন্নেসা এর কারণ ধরতে পারলে। মাঠের আল ভেঙে এবারেও দ্রুতপায়ে চলেছে সরফুন্নেসা, চাচী তার ছোট ছেলেকে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে আর দিয়েছে এক কেরেজ খাবার। মনটা খুব খুশী

আছে। তার হাতের মুরগীর গোস্ত আজ খুব ভালো রান্না হয়েছিল। প্রত্যেকটি মেহমান গুণ গেয়েছে। বলেছে ফুফির কাছে এর আগে এত ভালো দাওয়াত্ আর কখনো খায় নি তারা। খুশীমনে তাই চলেছে সরফুন্নেসা।

সপ্তমীর তির্যক চাঁদ হাসছে আকাশের এক কোণে। নীলাম্বরী জরির চুমকির বুটিদার ওড়নায় দেহ ঢেকে অভিসারে নেমেছে স্বৈরিণী রাত্রি। বাতাস বইছে তাই এলোমেলো—ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে অশান্ত একটানা সুরে।

নতুন মিনারের গা থেকে যেন একটা আলোর গোল্লা নামছে না? খালি খালি কি দেখতে কি দেখছে সরফুন্নেসা! কিন্তু সোনাউল্লাও তো দেখছে ওদিকপানেই বড়ো বড়ো চোখ করে। জ্যোৎস্না পক্ষ—দেখতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। আলোর গোলাটা মিনার থেকে নেমে আস্তে আস্তে গড়িয়ে কাছে এলো।

ও কসম্! এ যে কেরোসিনের টেমি হাতে গণি মিঞা।

গণি মিঞা কাছে এসে দাঁড়াল গম্ভীর মুখে।

: জিনকে রেয়াৎ কর না বিবি?

খিল খিল করে হেসে উঠে মুখে ওড়নার প্রান্ত গুঁজে দেয় সরফুন্নেসা।

: জিনকে রেয়াৎ করি বটে—কিন্তু মিঞা সাহেব জিন বন্‌লে কবে থেকে?

: কি করবো বলো বিবি—পেট বড়ো দুষমণ। পেটের জন্তেই তো নবাব বাড়ির কাজ ফিরৎ করতে পারলাম্ না। আবার আল্লার দরগায় বেইমানীও তো করতে পারি না। দিনে সকাল আটটার থেকে চারটে অবধি আমি হোসেনগঞ্জের খাস রাজমিস্ত্রী। কিন্তু তারপর আমি এই মিনারের তাঁবেদার। খাটুনি মেহন্নৎ পড়ছে খুব। তাগদ নেই মোটে। তা আল্লা যা ভালো বোঝবেন—তাঁর দোয়া হলে জমিন রাতারাতি মিনার গড়বে আশমান অবধি।

সরফুন্নেসার মুখের হাসি থেমে গেল। এই লোককে উদ্দেশ্য করে তারা সকলে মিলে কি খিস্তিই না করেছে!

: বড়ো তক্‌লিফ পড়ছে তো তোমার মিঞাসাহেব। তা এত কম আলোতে মজুর ছাড়া কেমন করে কাজ কর তুমি?

গণি হাসল একটু।

: গণিমিঞা কি আর টেমিতে কাজ করে? করে চোখের রোশ-নাইতে। মজুর আছে এক বেটা ছোঁড়া। তাকে পঙ্কের চুণ কিনতে পাঠিয়েছি। কাল খিলেনে হাত দোব। কাজ বড়ো ঢিলেতে এগুচ্ছে—একদিনের কাজ তিনদিনে হচ্ছে। এই দেখো না, আটদিনে মোটে ঐ পিপুলের মাথা ছাড়াল।

পঙ্কের কাজের জন্যে ঝিনুকের ঝোড়া আর কর্ণিকগুলো হেঁট হয়ে তুলে নিলে গণি। বাটালী, পাটা, কড়ী ওলন্ গুলো রেখে দিলে গুছিয়ে। ছোকরা এসে নিয়ে যাবে।

: চলো বিবিসা'ব। পীরগঞ্জে যাবে তো? আমিও যাব। আমিই তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি। পোয়াটাক পথ, চাঁদনী রাত আছে, দিব্যি চলে যাবে। কেন আর ও বাচ্চাটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাবে এত পথ? ও আবার ফিরবে তো!

সরফুন্নেসা না বলতে পারলে না। কেমন আকর্ষণ আছে গণির মধ্যে—মোহাবিষ্টা হয়ে পড়ল ও। গণি এ অঞ্চলের সবশ্রেষ্ঠ কারিগর—রীতিমতো শিল্পী। বংশানুক্রমে মিস্ত্রী—রাজমিস্ত্রী হিসেবে ও সেরা তো বটেই, পঙ্কের কাজে, মার্বেলের ঝিলিকেও ওর দক্ষতার তুলনা হয় না। তাছাড়া কাঠ খোদাইয়ের কাজেও ও পাকা। পট আঁকতে পারে—অনেক গুণ আছে গণি মিঞার। আর শুধুই কি গুণ? কি গড়ন ওর—আঁটসাঁট মজবুত গড়ন, মাছি পিছলে যায়। দীর্ঘ পেশল দেহের খাঁজে খাঁজে যেন গৈলানের মাঠের রুক্ষ কাঠিন্য লুকোচুরি খেলছে

—অতন্দ্র রাতের গভীরতা স্তব্ধ হয়ে আছে বিরাট দেহের অভ্যন্তরে।

সরফুন্নেসা মুগ্ধ চোখে তাকাল। কালো পাথরে গড়া নিখুঁত দেহীর মূর্তি! সযত্নে দু'চোখে সুর্মা টেনে দিয়েছে গণি। এটা ওর মূল্যবান শখ বা বিলাস প্রসাধন যা বলা যায়। একমাথা বাবরী চুল ফিরিয়ে পরিপাটি টেরী বাগানো—গন্ধ তেল লেপে দিয়েছে সারা মাথায়।

উনিশ বছরের রক্তে দোলা লাগে বুঝি পাশাপাশি চলতে চলতে।

অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করে সরফুন্নেসা।

: আচ্ছা মিঞাসাহেব, তুমি যে বলছিলে পেট বড়ো দুষমণ। পেটের জন্য কাজ কর। এ কথা তো বলব আমরা গরীব গুর্‌বা। তোমার এত রোজগার, খলিফা আদমী—তুমি কেন ও কথা বল ?

শাদা শাদা দাঁত বের করে গণি হাসে।

: জিন্দা থাকতে আমার আর খলিফা হওয়া হলো না বিবি—মুর্দাতে যদি হতে পারি। রোজগার তো করি বেতচ্ছন্দ্রূপ আল্লা কোর্বাণ কিন্তু ঘরে তো কেউ নেই। বেখেয়ালী করে উড়িয়ে ফেলি সব। শেষের দিকে ওর কণ্ঠ গাঢ় হয়ে আসে।

সরফুন্নেসাকে দেখে তাজ্জব বনেছে গণিও। ছোট বেলায় দেখেছে অনেকবার—রোগা রোগা একহারা গড়নের মেয়ে একটা। তারপর কবে যে ও বড় হয়ে উঠল, পর্দানশীন জেনানা হয়ে গেল গণি হিসেবেই ধরতে পারে না। কতকাল পরে এই মাঠের মধ্যে হঠাৎ ধরে ফেললো ওকে। খোয়াবেও কেউ যদি ওকে বলে যেত সরফুন্নেসা এমনটি হয়ে উঠেছে, লাবণ্য উছলে পড়ছে সারা অঙ্গ দিয়ে, তাহলে কি আর···

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল গণির।

: কসুর মাপ করো তো বিবি একটা কথা শুধোই।

: কি তাজ্জব! কি শুধোবে শুধোও না।

: আলতাফ এখন বেশ শুধরে গেছে তো ?

কি ছিল গণির দরদকোমল কণ্ঠস্বরে কে জানে। ঝর্ ঝর্ করে চোখের জল ঝরে পড়ল সরফুন্নেসার জাফরাণী ওড়নার ওপরে। দশখানা গাঁয়ের মধ্যে আলতাফ নামকরা নেশাখোর, শুধু নেশাখোর কেন, বয়সেও অনেক ফারাক্ সরফুন্নেসার সঙ্গে। তাই বুঝি সাদীতে সুখী হতে পারে নি সরফুন্নেসা। কিন্তু শুধুই কি নেশাখোর আলতাফ? নেশার আনুষঙ্গিক উদার মন নয় আলতাফের? বিহানে ওর আট জোড়া গরু ভঁইস নেই? জোতদার নয় সে? মস্তাজের না?

কিন্তু সরফুন্নেসা সে সব কথা কিছু বললে না, কেবল ওড়না সরিয়ে পিঠের অর্ধাংশ আর বাহুর ওপর দিক পানে নির্দেশ করলে। চিকণ শ্যামা রঙ ওখানে নীল হয়ে গেছে—ডোরাদার সাপের পিঠের মতো কালশিরা পড়েছে কয়েকটা পাশাপাশি।

গণি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। জরুকে মারাধরা এদেশে বে-আইনী নয় বটে, অত্যন্ত মামুলী ঘটনা, কিন্তু সে জরু যদি এমনটি জায়দাদ্ হয়, তবুও?

ঃ আলতাফ মেরেছে বুঝি মদ খেয়ে?

ঃ হ্যাঁ।

শুধু ছোট্ট একটি প্রত্যুত্তরে গণির কথা সমর্থনই করলে সরফুন্নেসা, আর কিছু বললে না। বললে না নেশার ঝোঁকে সরফুন্নেসার অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ একবারই মেরেছে তাকে আলতাফ। কিন্তু নেশা যখন কেটে গেল, কি অনুতপ্তই না হয়েছিল সে! দেয়ালে মাথা কুটেছিল বারবার। নারকোল তেলে ক্ষার মিশিয়ে গরম করে সারা রাত জেগে সরফুন্নেসার সর্বাঙ্গে মালিশ করে দিয়েছিল। নেশাজনিত অত্যাচারের এই যে প্রায়শ্চিত্ত—সাধারণ আদরসোহাগের চেয়ে সেকি অনেক মিষ্টি নয়?

সরফুন্নেসা তবু চুপ করেই রইল।

: কোরাণে লেখা আছে সাঁচ্চা মুসলমানদের মদ খাওয়া হারামী। দরপর্দা হারাম খাওয়ার সমান তহমতী গুণাহ।

সরফুন্নেসা শুধু নিঃশব্দে গণি মিঞার গা ঘেঁসে চলতেই লাগল পাশাপাশি। কোন উত্তর করলে না।

: আলতাফ রোজা করে? নমাজ পড়ে ঠিকমতো, আজান কানে শোনে?

: জাহান্নমে যাক্।

: আলতাফ তোমার শাদী করা হালখসম্—

: খসম্ খসম্—আখায় যাক্ অমন খসম্। আব্বাজান আবার সাধ করে আমার নাম রেখেছিল সরফুন্নেসা! সুলতান ঘরাণার পয়ছান। এমন নাম!

: সুলতান ঘরাণার পয়ছান শুধু নামই নয় তোমার বিবি, বাদশার হারেম সাজাবার মতো জেল্লা আর চেক্‌নাইও তোমার সুরতের।

সরফুন্নেসা মাতাল হয়ে উঠল। গণি মিঞা নামকরা তরীবতী গুণী, তার মুখে এই রকম প্রশংসা! কে না খুশী হয়?

: সাঁচ্চা বাত মিঞাসাহেব?

: খোদা কসম্। এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।

দৃঢ় মুষ্টিতে সরফুন্নেসার কোমল হাতটা পিষে ধরল গণি। এলোমেলো খোয়াভাঙার স্তূপ পেরিয়ে গেল।

চাঁদনী রাতে নির্জন মাঠে চলেছে দুজনে।

: তুমি বড়ো শরীফ্ আদমী মিঞা সাহেব।

: জিরাতদার মছিরুদ্দি চাচার মেয়ে তুমি। মছিরুদ্দি চাচা আর আমার আব্বাতে দোস্তী ছিল গলায় গলায়। দুজনে একটা কথাও প্রায়তক্ বলাবলি করত। তখন ছোট ছিলুম। তারপর জোয়ান হলুম মার্বেলের কাজ শিখতে গেলুম বিদেশে। ফিরে এসে শুনলুম

তোমার সাদী হয়ে গেছে। একটু সুযোগ সময় পাইনি আমি সরফুন্নেসা। জেহান বেশক্।

চোখে ঘোর লেগেছে যেন। স্বপ্নের মধ্য হতে সরফুন্নেসা বললে : একটা গান গাও মিঞা।

আরবী গজল ধরলে একটা গণি। নওরোজের গান। সুন্দর গলার কাজ গণির। মুগ্ধের মতো সরফুন্নেসা চলতে লাগল। কিন্তু পথ না দেখে চলার বিপদও আছে। উঃ—একটা বড়ো পাথরে ঠোক্কর খেয়ে আচম্‌কা সরফুন্নেসা পড়ে গেল একেবারে দড়াম করে।

যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল—আলতাফের মারের চাইতেও বেশী লেগেছে বুঝি।

গণিরই বুঝি পাঁজর ভেঙে গেল। দু হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি সরফুন্নেসাকে তুলে ধরলো পেশল বুকের মাঝখানেতে।

: কোথায় চোট লাগল ?

: আর কোথাও না শুধু এই হাতটা বড়ো জখম হয়েছে। অত্যুক্তি করেনি সরফুন্নেসা। আর এ ওর ছলও নয়। সত্যিই দেখতে দেখতে ডান হাতটা ফুলে ঢোল হয়ে উঠল। কালো হয়ে গেল সারা হাতখানা —যন্ত্রনায় নীল হয়ে গেল সরফুন্নেসার মুখও। মচকে গেছে না হাড় ভেঙে গেছে—বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

মাঠের মধ্যে একা গণি ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রচণ্ড রকম।

: চলো তোমাকে হাকিম সাহেবের কাছে নিয়ে যাই।

: না না, চলো বাড়ি যাই। কাল পরশুর মধ্যে সেরে যাবে ঠিক। না হলে হাকিম দেখাব পরে।

আবার চলল দুজনে। গণি ওকে প্রায় কোলে করে চলেছে। অবশ অঙ্গ ওর দেহেতে ঢেলে দিয়ে কাঁধে মাথা মিশিয়ে চলেছে

সরফুন্নেসা। পায়েতেও বোধ হয় লেগেছে ওর। তাই কি চলতে পারছে না ভর না দিয়ে ?

: বিবি—

: কি, বলো—

: আলতাফের ঘরে আর তোমাকে ফিরে যেতে দোব না আমি।

: সে কি ! সে হলো আমার খসমের ঘর !

: না, ঐ বুড়ো পাঁড় মাতাল তোমার খসম হতে পারে না। তোমার জুড়ী জওজ এই আমি—গণি মিঞা। আর তোমার মতো খুব্‌সুরত্‌ বিবির থাকার মানান জায়গা হচ্ছে এইখানটা।

সরফুন্নেসাকে আরো আকর্ষণ করলে গণি। সরফুন্নেসাও তা জানে !

: উঃ লাগে, লাগে, ছেড়ে দাও।

হঠাৎ খিল্‌ খিল করে হেসে উঠল সরফুন্নেসা ব্যথা ভুলে। : খুব তো সোজা কথা বলে দিলে। কিন্তু আমি আমার পেয়ারের মানান জায়গায় যাব কি করে ? এ হলো শাদী—এতো আর নিকে নয় যে তিন তালাক্‌ বাইন্‌ দিলেই চলে আসা যাবে ?

: সে আমি ভেবে রেখেছি। তুমি আগে আমার কাছে চলে এসো। হোসেনগঞ্জের নবাববাড়ির পিছ্‌মহল আমাকে দিয়েছে থাকতে, সেখানে নিয়ে গিয়ে তুলব। আলতাফ্‌ জানতেও পারবে না কোথায় গেল, আর যদিই বা জানতে পারে নবাববাড়িতে দাঁত ফোটাতে পারবে না। তারপর বিয়ে বাতিলের মামলা রুজু করে দোব। আলতাফ মাতাল, তোমাকে ধরে বেদম মারে, এইতেই তো হাকিম ডিক্রী দিয়ে দেবে আমাদের। মকদ্দমায় হার হবে আলতাফের—হাকিম ঠুকে দেবে ওকে খুব করে। রাজী রাগবৎ ?

শিহরণ খেলে গেল একটা সরফুন্নেসার সর্বাঙ্গ ঘিরে।

যেন কোন্‌ এক অজ্ঞ জগতের বার্তা শোনাচ্ছে গণি আকে।

: না না, এখন নয়।

শিউরে উঠল সরফুন্নেসা।

: আজকে ঘরে যেতে দাও—চাচী অনেক ভালো মন্দ রসদ দিয়েছে সঙ্গে, পেটুক লোক সে বসে আছে হাঁ করে। গোস্ত গিলিয়েই আসব।

: আজই ?

: না আজ হবে না, খোঁয়াড় বন্ধ হয়ে যাবে। কুকুর রয়েছে, ঘোর রাতে ঘর থেকে পা দাওয়ায় দিতে পারব না।

চিন্তিত হয়ে পড়ে সরফুন্নেসা।

: বেড়ি শেকলে পা আটকানো আমার—হারেমের বাড়া। ঠিক আছে। কালই আসব চলে—সন্ধে রেতে বোরখা ঢেকে ঘর থেকে বেরুব। চাঁদনি রাত আছে, চলে আসব ঠিক। মাঠের ধারে শেকুলের ঝোপের পাশে থাকবা তুমি মিঞা সাহেব। শ্যাল ডাকা পহরে আসবে কিন্তু। আসবে ঠিক।

: যো হুকুম, আপ কো মেহেরবাণী বিবিসাব।

উভয়েই হেসে ফেললে। তারপর সরফুন্নেসা সচকিত হয়ে উঠল।

: জনাব শেখের মাঠকোঠা এসে গেল। গাঁয়ের হাতায় এসে পড়েছি। এবার ছেড়ে দাও। দোসর থাকার সন্দ করবে। একলা যাই।

ভরা মন নিয়ে গণি খালি ঘরে ফিরে এলো।

এবার তার ঘর ভরবে।

সারাদিনটা যেন আর কাটতে চায় না। কাজের লোকের অবসরের দিন। জানানাদের মতো সাজগোজ করলে গণি সারাটা বিকেল ধরে। সাবান আর গন্ধতেল গায়ে উপুড় করে দিলে। সুর্মা আঁকলে ঘন করে।

গোলাপী রংয়ের চুড়ীদার পাঞ্জাবী, নীল চোস্ত পাজামা চাপকান

একবার বাবুরা বখশিস দিয়েছিল তাকে। ইনাম দিয়েছিল অনেক, কাজে জিয়াদা খুশ্‌ হয়ে মনিবে। তুলে রেখেছিল গণি টিনের তোরঙ্গতে। কখনও পরে নি—পরবেতে প'রবে বলে আনকোরা রেখেছিস। ঈদ্‌-ঈ মোবারক নয়, আজই তার সেই পরবের দিন।

শ্রেষ্ঠ সার্থক দিনটি আজ তার জীবনের। দিলে জোয়ার লেগে গেছে। মনের মতো বৌ নিয়ে আসবে আজ গণি। এনে ঘর সাজাবে।

অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠবার আগেই গণি এসে গেল মাঠের ধারে। আজ আর সে কাজে যায় নি। রোজের কাজ কামাই করেছে—বেরোজের কাজও নয় আজ। মিনারও গড়বে না আর আজকের দিনে।

ফাঁকা ঘরে বসে থাকায় চেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঢের ভালো।

দুঃসহ প্রতীক্ষা।

ঠিক শ্যালডাকা 'পহরে চলমান একটি নারীমূর্তি দেখা গেল দূরে। ঠাহর করে দেখলে গণি।

সরফুন্নেসা আসছে।

বোরখা পরে নি তো! হেলে দুলে আনন্দের ঢেউ তুলে আসছে চারিদিকে। ভারী খুশ আছে আজ সরফুন্নেসা।

কিস্‌মতুল্লা! ও কি একা আসছে?

: আজ যে বড়ো আমার বিবির মাঠে বেড়াবার শখ হলো রেতে?

: বাঃ, চাঁদনী রাতে তোমার সঙ্গে বেড়াবার শখ করব না? বছর ঘুরল তো মোটে সাদী হয়েছে আমাদের—শখ আহ্লাদ সব উবে যাবে নাকি দিল থেকে আসমানের পানির মতো?

: দেখো দেখো আরে! নীল রংয়ের শেয়াল একটা ঐ শেকুলের ঝোপের আড়ালে আড়ালে ছুটে পালাচ্ছে।

: দাঁড়াও তো দেখাচ্ছি—

সরফুন্নেসার লক্ষ্য নির্ভুল নাকি এত চিরকাল ?

: লেগেছে ঠিক।

: আরে ছ্যাঁচড়া চোর কি শেয়াল হবে। যেতে দাও—চলো ওদিকে বেড়াই।

আধলা ইঁটটা যথাস্থানে এসেই পড়েছে। ঝুরঝুরিয়ে রক্ত পড়ছে। হামাগুড়ি দিয়ে আহত স্থানটা চেপে ধরে বসে পড়ল গণি। রাজমিস্ত্রীকে নাকি ইঁটের ঘা লাগে না ? বিস্মিত দৃষ্টিতে মাঠের ওপারে আবছা হয়ে আসা ছুটি নরনারীর দিকে তাকিয়ে রইল সে। হ্যাঁ, ঠিক দেখেছে গণি ডান হাত দিয়েই তো তাগ্ করে ইঁট তুলল সরফুন্নেসা। ডান হাতখানা তা হলে সেরে গেছে ওর এর মধ্যে ? ব্যথা নেই আর ?